গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ : পাঁচটি কেস-স্টাডি (১৯৫২-১৯৯৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে
এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

498087

তত্ত্বাবধায়ক

ড.আশা ইসলাম নাঈম
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Library
498087

গবেষক

শামীমা নাসরীন
ইতিহাস বিভাগ
রেজিষ্ট্রেশন নং:৩০৬
সেশন:২০১০-২০১১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

শামীমা নাসরীন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ ঃ পাঁচটি কেস-স্টাডি (১৯৫২-১৯৯৪)" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যায়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

498087

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. আশা ইসলাম নাঈম) 18/4/2016
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ ঃ পাঁচটি কেস-স্টাডি (১৯৫২-১৯৯৪)' শিরোনামে গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে দেওয়ার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণা কার্যটি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক ড. আশা ইসলাম নাঈম-এর আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন ইতিহাস বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মুনতাসির উদ্দিন খান মামুন। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অভিমত ও লিখিত গ্রন্থ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণার নেপথ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দিন আহাম্মেদ। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিনকে, যিনি আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

498087

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি, জাতীয় সংগ্রহশালা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, সুনামগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র থেকে আমি তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারি এবং রেজিষ্টার বিল্ডিংএ এম,ফিল বিভাগের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আমার জীবনসঙ্গী মাসুদুর রহমান ও কন্যা অনিত্রী রহমানের সহযোগিতা ছাড়া গবেষণাটি সম্পন্ন করা দুরহ ছিল তা বলা বাহুল্য। যারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা না করলে গবেষণাটি সম্পন্ন হতো না, আমি তাঁদের কাছে ঋণী। সর্বোপরি এই অভিসন্দর্ভটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদি সামন্যতম অবদান রাখে তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

শামীমা নাসরীন

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যায়ন পত্র	i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ii
সারসংক্ষেপ	v
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : ভাষা আন্দোলনে দু'জন নারীর ভূমিকা	১৫
১.১ রওশন আরা বাচ্চু	১৫
১.১.১ পরিবারিক জীবন	২১
১.১.২ শিক্ষা ও কর্মজীবন	২২
১.১.৩ আত্মোপলব্ধি	২৭
১.১.৪ মূল্যায়ন	২৮
১.২ ড. হালিমা খাতুন	৩১
১.২.১ পারিবারিক ও কর্মজীবন	৩৭
১.২.২ শিক্ষা জীবন	৪০
১.২.৩ আত্মোপলব্ধি	৪২
১.২.৪ মূল্যায়ন	৪৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : স্বাধীনতা যুদ্ধে দু'জন নারীর ভূমিকা	৪৬
২.১ কাঁকন বিবি	৪৭
২.১.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা	৪৯
২.১.২ একাত্তর পরবর্তী জীবনযাপন	৪৯
২.১.৩ ছিয়ানব্বই পরবর্তী জীবনযাপন	৫০
২.১.৪ আত্মোপলব্ধি	৫১

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৫	মূল্যায়ন	৫১
২.২	মমতাজ বেগম	৫৩
২.২.১	পারিবারিক জীবন	৫৬
২.২.২	শিক্ষা ও কর্মজীবন	৫৬
২.২.৩	স্বাধীনতার পরবর্তী জীবনযাপন	৫৭
২.২.৪	আত্মোপলব্ধি	৫৮
২.২.৫	মূল্যায়ন	৫৯
তৃতীয় অধ্যায় : শহীদ জননী জাহানারা ইমাম		৬২
৩.১	জাহানারা ইমাম	৬২
৩.১.১	শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন	৭৪
৩.১.২	কর্ম ও সাহিত্য জীবন	৭৬
৩.১.৩	মূল্যায়ন	৭৭
উপসংহার		৮০
পরিশিষ্ট		৮৩
	ক. পরিচিতি	৮৩
	খ. গ্রন্থপঞ্জী	৮৮
	গ. প্রশ্নমালা	৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে গণমানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির যে আন্দোলন সেটাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ভারতীয় উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে বাংলার গ্রামগঞ্জ ও শহরের বহু নারী সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র হয়। পরবর্তী সময়ে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিতে গড়ে ওঠে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা উত্তর মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ড. হালিমা খাতুন ও রওশন আরা বাচ্চুর অংশগ্রহণ ও তাঁদের সার্বিক তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাঁকন বিবি ও মমতাজ বেগমের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার প্রতিপাদ্য, গবেষণার পদ্ধতির বিবরণ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যে সব তথ্য ও প্রবন্ধাবলী লিখিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে ভূমিকাতে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় দু'জন নারী এবং ২য় অধ্যায় দু'জন নারীর কেস-স্টাডির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। জাহানারা ইমাম জীবিত না থাকার কারণে তাঁর ছোট বোন তাহমিদা সাঈদা এবং দু'জন সহযোগী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ও সৈয়দা সালমা হকের সাক্ষাৎকার ও ২য় পর্যায়ের উৎস থেকে ৩য় অধ্যায় রচিত হয়েছে। উপসংহারে রয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়ন।

১৯৫২ থেকে ১৯৯৪ পযর্ন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই ৫ জন নারীর ভূমিকা অপরিসীম। এই ভূমিকা ফুটিয়ে তোলার জন্য শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে - 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ: পাঁচটি কেস-স্টাডি (১৯৫২-১৯৯৪)'।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাঙ্গালি বিপ্লবী জাতি। এই জাতির গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আছে তার নৃতাত্ত্বিক ও ভূখণ্ডগত পরিচয়, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, নানা ধরনের সংমিশ্রণ, গ্রহণ-বর্জন, উত্থান-পতন, আর বিদ্রোহ বিপ্লব।[১] ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে গণমানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলনই গণতান্ত্রিক আন্দোলন। দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অধিকার আদায়, সামাজিক অবমুক্তি, নারী শিক্ষা বিস্তার, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন তথা শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন নারীরা। নারী সমাজের শৃংঙ্খল মোচনের জন্য দেশমাতার শৃংঙ্খল মোচন প্রয়োজন। এটাই ছিল নারী আন্দোলনের সূচনা পর্বে নারী সমাজের শ্লোগান।[২]

ভারতীয় উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয় ব্রিটিশ -বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ আন্দোলনের সফল অংশীদার ছিলেন নারী। নারী সমাজকে বাদ দিয়ে বাংলার কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্য অর্জন করতে পারে না-এই কথাটি বাংলার বীর নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রোথিত করেছিলেন আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে।[৩] ব্রিটিশ যুগে বাংলার কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু অংশ গ্রহণই নয়, আন্দোলন পরিচালনায়, সশস্ত্র সংগ্রামে, ত্যাগ স্বীকার, সংগঠন গড়ে তোলায় বাংলার কৃষক নারীরা শৃঙ্খলা, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। একই সঙ্গে কৃষক নারীগণ সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।[৪] ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক শাসনের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জনগণের মধ্যে দেশরক্ষার আদর্শ জেগে ওঠে। নারীসমাজও রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে গড়ে তোলেন বিভিন্ন সংগঠন। এর মধ্যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (১৯২৬), কংগ্রেস মহিলা সংঘ (১৯৩৯), মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি (১৯৪১), মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (১৯৪২),হিন্দু-মহাসভা মহিলা সমিতি, খৃষ্টান মহিলা সমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৫] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত হয় পাকিস্তান। শুরু হয় ধর্ম-নির্ভর রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, নিঃস্ব হয় লাখ লাখ মানুষ এবং অগণিত নারী অপমানিত হয়, সম্ভ্রম হারায় ।[৬] এই চরম সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে আসেন। তিনি তৎকালীন মুসলিমলীগ- এর হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করেন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে 'শান্তি সেনা' নামে একটি বড় দল গঠিত হয়; বহু নারী সেই দলে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দাঙ্গা বিরোধী অসংখ্য মিছিল। ১৯৪৭ এর অক্টোবর মাসে কলকাতার হিন্দু মেয়েরা পূঁজায় নিমন্ত্রণ করে মুসলিম মেয়েদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

আর মুসলিম মেয়েরা ঈদে আমন্ত্রণ জানায় হিন্দু মেয়েদেরকে। এভাবে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর চেষ্টা চলে।[৭] এর পরবর্তী সময়ে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিতে গড়ে ওঠে আন্দোলন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর শুরু হল পাকিস্তানী শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা। পাকিস্তানী শাসকগণ বাঙ্গালির জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও জীবন ধারার উপরে আঘাত হানে। তারই বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ রুখে দাঁড়ায় (১৯৪৮ সালে জনাব শামসুল আলমকে আহ্বায়ক এবং জনাব আব্দুল মান্নানকে যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করে ২৮জন সদস্য নিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দাবীর পক্ষে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়)। শিশু রক্ষা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কর্মী-সদস্যরা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় 'সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদে' লিফলেট বিতরণ করা, মহিলাদের সভা করা, তাদের মধ্যে সঠিক বক্তব্য পৌঁছানো ইত্যাদি ছিল এসব সংগঠনের কাজ। এ কাজে সরকারি দমননীতি উপেক্ষা করে বেগম সুফিয়া কামাল, কামরুন্নাহার লাইলী, হালিমা খাতুন, নূরজাহান মুরশিদ, আফসারী খানম ও আরো অনেকে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন ।[৮]

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার লক্ষ্যে বাঙ্গালি নারীরা তথা ছাত্রী সমাজ জীবন বাজী রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজধানীসহ সারাদেশে ভাষা রক্ষার কাজ করেছেন শিক্ষিকা, গৃহিণী, কর্মীসহ সকল স্তরের নারী। জীবনের মায়া ত্যাগ করে তারা নানা গোপন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার তারা আদায় করে নিয়েছিলেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মিছিলে যাওয়া, রাজপথে শ্লোগান দেওয়া, পোস্টার লেখা, সেবা, শহিদ মিনার নির্মানসহ নানা কাজে বাঙ্গালি নারীরা ছিলেন সক্রিয়। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ছাত্রী সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে সুফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, রওশন আরা রেণু, সুফিয়া আহমেদ, সারা তৈফুর, সোফিয়া খান, শরীফা খাতুন, অধ্যাপিকা শামসুন নাহার, কামরুন নেছা, সুফিয়া আলী, সুরাইয়া হাকিম, সুরাইয়া ডলি, নাদেরা বেগম, নূরুন্নাহার কবির, রোকেয়া মাহবুব, সুফিয়া ইব্রাহিম, মমতাজ বেগম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ছাত্রীরা কেবল ছাত্রদের বা নেতাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেনি বরং এই সিদ্ধান্তগুলোকে মূল্যায়নের মাধ্যমে তারা অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বা না করার যে বিতর্ক চলছিল সমবেত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েরাই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হলে উপস্থিত ছাত্রীরা ক্ষেপে যেত। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৪৪ ধারা ভাঙতে ১০জনের একেকটি দল বিশ্ববিদ্যালয় চত্তর থেকে বের হয়ে শান্তিপূর্ণ শ্লোগানসহ পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যাবে। মিছিলে অংশ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য ছাত্রীরা এসেছিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় দল বের হলে গেটে ব্যারিকেড দেওয়া পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে কৌশলগত কারণে

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী দল ছাত্রীদের নেতৃত্বে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্রী দলের নেতৃত্বে ছিলেন সুফিয়া খাতুন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া আহমেদ, অধ্যাপিকা শামসুন নাহার, সুরাইয়া হাকিম, হালিমা খাতুন প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নেতারা। তাদের অনেকেই পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছিলেন। আন্দোলনে সক্রিয় থাকার কারণে অনেক নারীকেই কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের পর মহিলা সমাজেও চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১২ নং অভয় দাস লেনে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে মহিলারা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ করেন ও একটি নিন্দা প্রস্তাব দেন।[৯]

২১ ফেব্রুয়ারির পরে দেশব্যাপি যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার ছাত্রী ও সাধারণ নারীরা অংশগ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন মুলতবির দাবিতে বিরোধী দলের নেতা মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের সাথে একমাত্র বিরোধীদলীয় মহিলা সংসদ সদস্য আনোয়ারা বেগম অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বলাবাহুল্য, ভাষা আন্দোলনের প্রাণের দিকটা তৈরী হয়েছিল আপোষহীন প্রগতিশীল রাজনীতির সংকল্প থেকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে দেশের নারী সমাজের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও আজও তার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি মেলেনি। এই দেশের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য তথা গণমানুষের জন্য সংগ্রাম করেছে দীর্ঘদিন তার সাফল্য, ব্যর্থতা, জয় এবং পরাজয় আছে। আমাদের মতো দেশে নারী আন্দোলনের বিকাশ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের বিকাশের ধারার বাইরে কিছু হতে পারে না। তাই ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকাকে নতুন করে শক্তি যোগানো আমাদের কর্তব্য ।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়। এই নির্বাচনে নারী প্রার্থী হিসেবে নূরজাহান মুরশিদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন নেসা খাতুন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩ জন নারী সদস্য আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। সে সময় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নেলি সেন গুপ্তা। এই বিজয় নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং নারীরা তখন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বরে আইন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মুরশিদ, বেগম রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[১০] ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনেও নারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে ১৯ জানুয়ারি আন্দোলনকারী ছাত্রীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরের দিন ২০ জানুয়ারি ঢাকা 'ল' কলেজের ছাত্র আসাদ শহিদ হন।[১১] এর প্রতিবাদে ও বিক্ষোভ মিছিলে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- যুক্তফ্রন্ট- ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর পূর্বপাকিস্তানের ৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। রাজনৈতিক দল গুলো হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলামী এবং গণতান্ত্রিক পার্টি, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য এই দল গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের বড় দল হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং তারাই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository
২৪ জানুয়ারি হরতাল পালনের সময় ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা হাতে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেলে তাঁর পেছনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যান। ফেব্রুয়ারিতে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ শোক মিছিল বের করে। ১৯৬৯ এ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পরই আসে শেখ মুজিবুর রহমান এর অসহযোগের ডাক। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দেশব্যাপী নারীরা শেখ মুজিবুর রহমান এর অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী নারী জাগরণের যে জোয়ার বইতে শুরু করে তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টরে নারীদের বীরত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। নারীসমাজের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বক্ষেত্রে আকস্মিক ছিল না। পুরুষের পাশাপাশি সচেতন নারী সমাজ এবং প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নারীরা বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকায় লিপ্ত ছিলেন। নারীর এই সক্রিয়তা কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে থেকে। যেভাবেই হোক এ মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল।

১৯৭২-এর সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ধর্ম-নির্ভর রাজনীতি পুনরায় শুরু হয়। প্রথম পর্বে সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরে নির্বাচিত শাসকদলের সহযোগিতায় মৌলবাদি ও সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পূনর্বাসিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিও ছিল তৎপর।

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে প্রথমে *মুক্তিযোদ্ধা সংসদ*-কে ঘিরে এবং পরবর্তীকালে *একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটি*র নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৯২-এর ১৯ জানুয়ারি গঠিত হলো একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটি।[১২] এ লড়াই জোরালো হয়ে ওঠে একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচারের দাবিকে কেন্দ্র করে , যার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। তিনি হয়ে ওঠেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিভূ, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিনিধি। তিনি *একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি*র সভাপতি হিসেবে স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রগতিশীল আন্দোলনে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একাত্তরে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেননি কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধার মা ও মুক্তিযোদ্ধার আশ্রয়দাত্রী হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্যেও ঢাকা শহরে বসবাস করে প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন থেকে লক্ষ্য করেছেন যুদ্ধের নানা উত্থান-পতন এবং গতিপ্রকৃতি। পাকসেনাদের উত্থানে ব্যথিত হয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের উত্থানে হয়েছেন আনন্দিত। লিখেছেন প্রতিদিনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক যাবতীয় বৃত্তান্ত, পরবর্তী সময়ে যা 'একাত্তরের দিনগুলি' নামে প্রকাশিত হয়ে ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ধারণ করে আছে তাঁর তৎকালীন কর্মকাণ্ডের বৃত্তান্ত।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

যে মানবিক বোধে তখনো তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন, তা কেবল একজন মহৎজনের পক্ষেই সম্ভব। সে মহত্ত্ব মানায় একজন মুক্তিযোদ্ধাকেই। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি হারিয়েছেন তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ছেলে রুমি ও তাঁর স্বামী শরীফ ইমামকে। এই শোক পরবর্তী সময়ে জাহানারা ইমামের শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিবেদিত করেন। ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারী 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে।[১৪] দেশব্যাপী গণসাক্ষর, গণসমাবেশ, মানব বন্ধন, সংসদ অভিমুখে যাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট মহাসমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ গণআদালতের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণআদালত বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেতৃতে গণতদন্ত কমিটি ঘোষিত হয়। এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সুফিয়া কামাল। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে রাজপথে বিশাল সমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রির্পোট হস্তান্তর করেন।[১৫] ১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমাবেশে পুলিশের নির্মম লাটিচার্জের শিকার হন জাহানারা ইমাম।[১৬] তিনি অসুস্থ হন, এরপর তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে। ১৯৯৪ সালের ২ এপ্রিল চিকিৎসার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান। এরপর ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৭] যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারদের বিচারের আওতায় আনার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে রাজাকার কাদের মোল্লা এবং মোঃ কামারুজ্জামানের ফাঁসি কার্যকারের মাধ্যমে। এই গবেষণা কর্মে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে জাহানারা ইমামের তিরোধান-কাল, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে নারীর ভূমিকাকে পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়। মুক্তিযুদ্ধের বয়স আজ ৪৪ বছর, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই মহান যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করা আজও সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই জন্য যে উদ্যোগের ঘাটতি ছিল তা নয়, বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে অনেক গ্রন্থ, চলচ্চিত্র ও চিত্রকর্ম অংকিত হলেও মূলত: অভাব ছিল পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গির। অধিকাংশ গ্রন্থ, চিত্রকর্ম ও চলচ্চিত্র-প্রণেতা বিষয়গুলোকে দেখেছেন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে এযাবৎ কালের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকাকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। বর্তমান গবেষণা-কর্মে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুরুষের ভূমিকাকে ছোট করে না দেখে সংগ্রামী নারীদের ভূমিকার ন্যায্য স্বীকৃতির একটা প্রচেষ্টা চালানো হবে, যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষপাতহীন ইতিহাস সংকলনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য পর্যালোচনা

নারীর ইতিহাস পুনর্গঠনের একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে উপাত্তের অপ্রতুলতা; এ সমস্যার কারণে নারী ঐতিহাসিকরা প্রচলিত উপাত্ত সন্ধানের বাইরে গিয়েও অপ্রচলিত উপাত্ত যেমন ব্যক্তিগত ডায়েরী, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতিকে উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই আমাদের এই গবেষণা কর্মটিতেও মৌলিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থকে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মফিদুল হক রচিত *নারী মুক্তির পথিকৃৎ* গ্রন্থটি ২০০৭ সালে ঢাকার দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং পরবর্তী বিভিন্ন সংগ্রামে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনসহ সাফিয়া খাতুন, লীলা রায়, আমতুস সালাম, মনোরমা বসু, জাহানারা ইমাম, সেলিনা বাহার জামান প্রমুখ এর তৎকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারী আন্দোলন, মনোরামা বসুর ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর বিভিন্ন সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ততা এবং দৌলতুন্নেসা খাতুনের ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে অবদানসহ ১৯৭৯-এ সংসদ সদস্য রূপে মনোনয়ন। এই বইটিতে বিভিন্ন সংগ্রামে ১২ জন নারীর অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে। যা নারী বিষয়ক গবেষণায় একটি সহায়ক গ্রন্থ।

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক রচিত *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* ঢাকা দি ইউনিভাসিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশ করা হয়। বইটিতে লেখকদ্বয় ১৮ থেকে ২০ শতক-- তিনশ বছরের বাঙালি নারীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। এই দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বাঙালি নারীর যাপিত জীবনের নানাদিক আলোকপাত করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। হাজার হাজার বছরের অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার অচলায়তন ভেঙে বাঙালি নারী কিভাবে আজ দেশের ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করতে পেরেছে তার এক ধারাবাহিক বিবরণ এ গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে বাঙালী নারীর জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি নিরবিছিন্ন সংগ্রাম, সাফল্য, বিপুল ত্যাগ তিতিক্ষা ও সুগভীর বেদনার কাহিনীতে সমৃদ্ধ। তাঁদের এ উত্থান ছিল বন্ধুর, তবে আজও তাদের চলার গতি নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের নারীদের বর্তমান জীবন পরিস্থিতিকে উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটিতে নারী সংশ্লিষ্ট সব বিষয় উপস্থিত কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান সম্পন্ন নারীদের ভূমিকা অনুপস্থিত।

২০০২ সালে ঢাকা থেকে দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড প্রকাশনা থেকে মালেকা বেগমের *বাংলার নারী আন্দোলন* বইটি প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে মালেকা বেগম তুলে ধরেছেন, নারীদের অবরুদ্ধ, পশ্চাৎপদ সমাজ ও সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার চিত্র। আবার এটি প্রতিহত করে, নারী জাতি সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেই বিষয়টিও তাঁর লেখায় উল্লিখিত হয়েছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর পূর্বেও বহু বঙ্গনারী সমাজে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository
সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই বিষয়টি লেখক তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে লেখক নারীর বর্তমান অবস্থার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামী নারীদের গবেষণার জন্য সহায়ক।

ঢাকা দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড প্রকাশনী থেকে ২০০০ সালে আতিউর রহমান সম্পাদিত, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ হাসেমী, এসএম আকাশ এবং লেলিন আজাদের *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি* গ্রন্থটি প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে তাঁরা ভাষা আন্দোলনের উপর প্রকাশিত বিআইডিএস কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদনসমূহ সন্নিবেশিতভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় মূলত, ভাষা আন্দোলন। পরবর্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনটা ছিল মুখ্যত; একটি জাতীয় সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন কেন? এই আন্দোলন কি নিছক একটি মনস্তাত্বিক ব্যাপার ছিল, নাকি এর শিকড় ছিলো আরো গভীরে? সে-সময়ের আর্থ-সামাজিক শোষণ-নিপীড়নের পটভূমিতে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটিতে। এখানে নারীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়নি। তবে এই গ্রন্থে আলোচিত আন্দোলনের বিবরণ থেকে সহায়তা নিয়ে ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদান আছে, এমন দ'ুজন নারীদের ভূমিকা আমার গবেষণায় আলোচিত হয়েছে।

তিন খণ্ডে রচিত বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ঢাকার জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশ হয়। যা ভাষা আন্দোলন ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য একটি আকর গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শুধু ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলীর ইতিহাস ও তার পর্যালোচনাই করা হয়নি বরং সমকালীন সব উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনাও সংক্ষিপ্তভাবে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইটি ভাষা আন্দোলনের উপর একটি মৌলিক গ্রন্থ হলেও এখানে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদানের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি এই ঘাটতি পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

১৯৯৯ সালের ঢাকার ওসমান গনি প্রকাশনী থেকে শওকত আরা হোসেনের *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগের বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মমতাজ বেগম ও কাঁকন বিবি সম্পর্কে গবেষণায় এটি সহায়ক গ্রন্থ।

ঢাকার ইনিস্টিটিউট ফর এনভায়ারনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকাশনী থেকে ২০০৬ সালে কবির মুজিব মেহেদীর *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশে এবং দেশের বাইরে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২০০০ সালে ঢাকার ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স থেকে মেহেরুন্নেসা মেরির *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা* গ্রন্থটি প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে ভাষা আন্দোলন এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক মতিয়া চৌধুরী, অমিতা বসু, অধ্যাপিকা জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার,

Dhaka University Institutional Repository

জাহানারা পারভিন শোভা, নাদেরা বেগম, লীলা নাগ, বদরুন্নেসা, সুহাসিনী দাস, বেগম সুফিয়া কামাল প্রভৃতি সংগ্রামী নারীদের কথা এই গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। এই বরেণ্য নারীদের বাইরেও আরো অনেক নারীদের অংশগ্রহণ ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। বর্তমান গবেষণায় সংযোজন করা হয়েছে মমতাজ বেগম ও কাঁকন বিবির নাম।

ড. এম এ হাসানের *মুক্তিযুদ্ধ এবং নারী* গ্রন্থটি ২০০২ সালে ঢাকার ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান ষ্টাডিস সেন্টার থেকে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে রচিত। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে ৪২ টি জেলার ২৫টি থানায় গৃহিত অসংখ্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া বাহাত্তরটি সাক্ষাৎকার। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ভারত ও পার্শ্ববর্তী অন্যন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদের সম্পর্কে। সামগ্রিক গবেষনায় ৪ লাখেরও বেশি নারী নির্যাতিত হয়েছেন- তার মধ্যে শতকরা ৪৯.৫০ ভাগ মুসলিম, ৪১.৪৪ ভাগ হিন্দু, ২.০৬ ভাগ খ্রিষ্টান। এছাড়াও নারীদের দুঃসহ জীবন, বৈধব্য, বিপর্যয়, জীবনের সংকট ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যর্থতার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ডঃ এম,এ, হাসান সামাজিক ইতিহাস রচনা করে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ন ঘাটতি পূরণ করেছেন।

২০০৭ সালে ঢাকার শব্দশৈলী প্রকাশনী থেকে জোবাইদা নাসরীনের *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী* গ্রন্থটি প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে শুরু করে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য নারীদের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে টংক আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা এক গারো নারী ললিতা এন মারাকের ভূমিকাসহ কাঁকন বিবি, প্রিনছা খেঁ, বাবানী রাজগৌড়, রাঙ্গামা কুমী, সালপী খাড়িয়া, লক্ষী সবর, মরতিয়া রবদাস, মাহালী তাঁতী, সাবিত্রী নায়েক, বিন্দু নায়েক, সুরধনী নায়েক, শান্তি ভূমিজ, যশোধা নায়েকসহ আরো অনেকের সংগ্রামী জীবনের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই গ্রন্থে ঘটনার বিস্তারিত বর্ননা নেই। গ্রন্থটি মূলত আদিবাসী নারীদের সংগ্রামী জীবন নিয়ে গবেষণার জন্য সহায়ক। যা আমার গবেষণায় কাঁকন বিবি সম্পর্কিত আলোচনায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তথ্য মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৬ খণ্ডে রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* প্রকাশ হয়। তবে ১৩০০০ পৃষ্ঠার এই দলিলপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়নি। শুধুমাত্র এই দলিলপত্রের ৮ম খন্ডে কিছু নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে। এখানে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক সুদীর্ঘ ৯মাসব্যাপী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজের উপর যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের ভূমিকার বিবরণ অনুপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ফোরকান বেগম রচিত গ্রন্থ *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*। এই গ্রন্থটি কয়েকজন ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় (সাইফ মুহম্মদ আশরাফ আর সাদী, নাদিম মুহম্মদ তৌহিদ আল রুমী, সামিয়া আফরীন নীপা) পুটিনা রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে লেখক ও তাঁর সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে অবদান রেখেছেন তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। তবে এ গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়িত না হলেও মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান মূল্যায়নের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী* গ্রন্থটি নারীর ইতিহাস পূনর্গঠনে সহায়ক বলে বিবেচিত।

একাত্তরের দিনগুলি শহিদ জাহানারা ইমামের ডায়েরী ১৯৮৬ সালে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়। গ্রন্থে লেখকের ব্যক্তিগত দিনলিপি তুলে ধরা হয়েছে। লেখক ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয় গবেষণার জন্য এটি একটি সহায়ক গ্রন্থ।

সুফিয়া কামালের *একাত্তরের ডায়রী* গ্রন্থটি ঢাকার জাগৃতি প্রকাশণী থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে লেখক দেশের ভেতর থেকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ডায়রিতে মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থটি একজন নারীর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতার স্মৃতি। প্রত্যক্ষ স্মৃতি হিসেবে নারী ইতিহাস পূনর্গঠনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ডায়েরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গবেষণায় নারীর যাপিত জীবন এবং সমাজ ও রাজনীতিতে তার অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ধরনের গবেষণায় ডায়েরী একটি গুরুত্বপূর্ন উৎস।

১৯৯৮ সালে ঢাকার নিউ এজ পাবলিকেশন্স থেকে তপন কুমার দের *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ* গ্রন্থটি প্রকাশ হয়। গ্রন্থটিতে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ, অবদান এবং নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন। কবি মেহেরুনেছা, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, লুৎফুন নাহার হেলেনা, জাহানারা ইমাম, মালেকা বেগম, মতিয়া চৌধুরী ও মমতাজ বেগমসহ অন্যান্য নারীদের অবদান উপস্থাপন করেছেন।

গবেষণার সময়কাল ও উদ্দেশ্য

নারী ইতিহাস গবেষণায় একদিকে যেমন সনাতন উপাত্তের বাইরেও অপ্রচলিত উপাত্তের সন্ধান করতে হয়, তেমনি কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কালসীমার সন্ধান করা হয়। এই গবেষণার সময়কাল ১৯৫২ সালের ভাষা অন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের তীরোধানকাল পর্যন্ত। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা যার প্রভাব এদেশের পরবর্তীকালের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের মধ্যে দেখা গিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার ছাত্রী সমাজ তথা নারীসমাজ সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে, যা অব্যাহত থাকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নতুন রাষ্ট্র বাংলদেশে। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository
নারী সমাজ তার রাজপথে নামা থেকে নিজেকে বিরত রাখেনি। নারীর ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে তাই ১৯৫২ একটি উল্লেখযোগ্য সাল।

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে নির্বাচন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে অসহযোগ আন্দোলন এরপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে, একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়, শুরু হয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। মৌলবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে জাহানরা ইমাম ১৯৯২ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। সেই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন জাহানারা ইমাম। তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক। তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল সারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পক্ষ শক্তির কণ্ঠস্বর। ১৯৯৪ সালে তার মৃতুতে জাতি ক্ষনিকের জন্য থমকে দাঁড়ালেও তাঁর আদর্শকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চয় করেছে। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের নারী সমাজের কাছে নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতার প্রতীক। বাংলাদেশের নারী সমাজকে তিনি দেখিয়েছেন সকল প্রতিকুলতার সামনে কিভাবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাঁর জীবনকাল তাই বাংলাদেশের নারী ইতিহাস গবেষণার কালসীমায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই গবেষণাটির সময়কাল তাই ১৯৯৪ সাল, জাহানারা ইমামের মৃতুর বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজের ভূমিকা তুলে ধরা। তবে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকা অনুসন্ধান করা।
২. ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নারীরা যে বিশেষ অবদান রেখেছে তা অনুধাবন করা।
৩. জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন রচিত হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ ও ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার পদ্ধতি ও উৎস

নারীবাদী গবেষণায় পদ্ধতি নির্ধারিত হয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ভেদে উৎস ভিন্ন হয়, পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। এই গবেষণায় মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাস পদ্ধতির মধ্যে জীবনকথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাস রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যেমন-১. সাক্ষাৎকার প্রতিলিপিকরণ, ২. প্রতিলিপির বিশ্লেষণ , ৩. সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শব্দ চয়নে ভাষাভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ, ৪. সংবেদনশীল বিষয় বিশ্লেষণে

Dhaka University Institutional Repository
মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগ, ৫. বিশ্লেষণ স্মৃতি সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহের প্রয়োগ এবং ৬. জীবনকথা বিষয়ক সাক্ষাৎকার এর বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ প্রভৃতি।

এ সকল পদ্ধতির মধ্যে এই গবেষণায় জীবনকথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারের বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের জন্য ১৪০টি প্রশ্নসম্বলিত একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নমালার আলোকে নির্বাচিত ৫ জন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যের অপ্রতুলতা বিবেচনা করে তাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে দু'জন নারীকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁরা হলেন রওশন আরা বাচ্চু এবং ড. হালিমা খাতুন। ৪ বার রওশন আরা বাচ্চুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রতিবার ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। ড. হালিমা খাতুন প্রতিবার ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। ২য় অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া দুজন নারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। মমতাজ বেগম এবং কাঁকন বিবির সাথে ৪ বার সাক্ষাৎ করা হয়েছে। মমতাজ বেগম তিনদিন সময় দিয়েছেন। কাঁকন বিবির সাক্ষাৎকার একবার নেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারে তিনি ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। পরবর্তীতে কাঁকন বিবি শারিরীকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে যোলঘর, সুনামগঞ্জে কাঁকন বিবির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরুর সঙ্গে কথা বলেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি সুনামগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক। ৩য় অধ্যায় রচিত হয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমামকে নিয়ে। জাহানারা ইমাম জীবিত না থাকার কারণে ২য় পর্যায়ের উৎস থেকে এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির দু'জন সদস্যের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তার আন্দোলন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গবেষণায় সাক্ষাৎকারদাতা নারীদের বক্তব্যসমূহের আনুষাঙ্গিক তথ্য উপাত্ত হিসেবে সমসমায়িক পত্র পত্রিকা পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়

রওশন আরা বাচ্চুর ৪ বার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে জুলাই মাসে ০২-০৭-২০১৩, ০৬-০৭-২০১৩, ১০-০৭-২০১৩ এবং ১৬-০৭-২০১৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন।

কাঁকন বিবির ২০১৩ আগষ্ট মাসে একবার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশী কথা বলতে পারছিলেন না। এজন্য কাঁকন বিবির পৃষ্টপোষক এডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরুর টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তিনি সুনামগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক । তিনি আমাকে ০৭-০৮-২০১৩ তারিখে সন্ধা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, ১১-০৮-২০১৩ তারিখে সন্ধা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এবং ১৫-০৮-২০১৩ তারিখে সন্ধা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। তিনি কাঁকন বিবি সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হালিমা খাতুনের কাছ থেকে ৪ বার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তিনি ২০১৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সাক্ষাৎকার দেন। ৪ বারই সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা করে ০৫-০৯-২০১৩ , ১০-০৯-২০১৩, ১৪-০৯-২০১৩ এবং ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে সাক্ষাৎকার দেন।

মমতাজ বেগম তিনবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রথম দু'বার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫ ঘন্টা করে, ঐ সময়ের ভিতর কিছু সময় তিনি দুপুরের নামাজ পড়েন এবং খাবার খান। ৩য় বার দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২ ঘন্টা। তারিখগুলো যথাক্রমে ০২-০১-২০১৪, ০৭-০১-২০১৪ এবং ১৩-০১-২০১৪।

জাহানারা ইমাম বেঁচে না থাকায় তাঁর ছোটবোন তাহমিদা সাঈদা ও দু'জন সহযোগী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ও সৈয়দা সালমা হকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ১৫-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। সৈয়দা সালমা হক ১৭-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। জাহানারা ইমামের ছোট বোন তাহমিদা সাঈদা ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। বর্ণিত ব্যক্তিদের অনুমতি নিয়ে তাঁদের কথা টেপরেকর্ডারে রেকড করা হয়েছে এরপর সেই রের্কড শুনে প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছে। তারপর গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে অভিসন্দর্ভটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

এই গবেষণাটি মূলত; তিনটি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে। তবে প্রথমে রয়েছে ভূমিকা এবং পরিশেষে উপসংহার।

প্রথম অধ্যায় : ১৯৫২- এর ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত দু'জন নারীর ভূমিকা নিয়ে কেস-স্ট্যাডির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়। দু'জন নারী হলেন রওশন আরা বাচ্চু ও ড. হালিমা খাতুন। এ দু'জন নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে তাদের সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে এই অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দু'জন নারী যোদ্ধার কেস-স্ট্যাডি নিয়ে রচিত ২য় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের দু'জন নারী হলেন আদিবাসী কাঁকন বিবি এবং অপরজন মমতাজ বেগম। এখানে মুক্তিযুদ্ধে কাঁকন বিবির অংশগ্রহণ এবং সামগ্রিক জীবন ধারা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অপরজন মমতাজ বেগমের কর্মজীবন, রাজনীতি ও সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ তার সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে জাহানারা ইমামের রাজনৈতিক অন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপক্ষে গণআন্দোলন এবং তার কর্মময় জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মের সীমাবদ্ধতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি গবেষণাকর্মের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার গবেষণা-কর্মটিও আলাদা কিছু নয়। এখানে আমার গবেষণা কর্মের কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হল:

১. বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুরুষদেরও ভূমিকা রয়েছে কিন্তু আমার গবেষণায় শুধুমাত্র নারীর ভূমিকাকে নিয়ে আসা হয়েছে।

২. গবেষণাকর্মটি মৌখিক ইতিহাস, স্মৃতিচারণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। স্মৃতির্নিভর ইতিহাস পুনর্গঠন বেশ দুরুহ কাজ। তথ্যাবলী যাঁচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত অনেক সময়ই পাওয়া যায় না যদিও এ ব্যাপারে সব রকমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটা এ গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে।

৩. সীমিত সংখ্যক কেস-স্টাডির সহায়তায় গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। আরো বেশি সংখ্যক উপাত্তের সমাহার এই গবেষণার পরিধিকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পারত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আয়শা খানম (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০১), পৃ. ৫।

২. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ.৬৮।

৩. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. xi।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১০১।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯।

৬. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ৬৯।

৭. রেণু চক্রবর্তী, *ভারতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা* (১৯৪০-১৯৫০) (কলিকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৮০), পৃ. ৮৯।

৮. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

১১. দৈনিক আজাদ, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ: ১।

১২. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা ১৯৯৫), পৃ. ৯।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯।

১৪. সংবাদ, ২০ জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃ: ১।

১৫. দৈনিক বাংলা, ২৮ মার্চ, ১৯৯৪, পৃ: ১।

১৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ মার্চ, ১৯৯৩, পৃ: ১।

১৭. দৈনিক বাংলা, ২৭ জুন, ১৯৯৪, পৃ: ১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনে দু'জন নারীর ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রওশন আরা বাচ্চু ও ড.হালিমা খাতুন। দু'জনই তখন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। রওশন আরা বাচ্চু দর্শন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী এবং হালিমা খাতুন ইংরেজি বিভাগের মাষ্টার'স-এর ছাত্রী ছিলেন । দু'জনই ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কলা ভবনের সামনে ছাত্র সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখা এ দুজন নেত্রী স্থানীয় নারীর সংগ্রামী ছাত্রজীবন, কর্মজীবন ও ব্যক্তি জীবনের আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১ রওশন আরা বাচ্চু

এই অধ্যায় রওশন আরা বাচ্চুর একাধিক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে । তিনি ২, ৬, ১০ এবং ১৬ জুলাই, ২০১৩ তারিখে প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা করে গবেষককে সাক্ষাৎকার দেন। ১৯৫২ সালে ভাষা অন্দোলনে যে সকল নারী অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু অন্যতম। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম ব্যরিকেড ভঙ্গকারী নারী। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃতিমনা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখেন এবং তিনি নাটক, আবৃত্তি, গান এবং প্রগতিশীল রাজনীতির সংঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ঐ সময় হাবিবুর রহমান শেলী (১৯৯৬ সালের কেয়ারটেকার সরকার প্রধান), হোসেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন, সেই পরিষদে তিনিও একজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা সবাই প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমান মেডিকেল কলেজ) যে সব সভা হত সেখানে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। অনেক সময় গোপন সভা হত এবং তিনি সে সব সভায়ও অংশগ্রহণ করতেন। রওশন আরা বাচ্চু দৃঢ়ভাবে বলেন, ভাষা আন্দোলন ছিল মাতৃভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার একটি জাতীয় আন্দোলন। তাই তিনি রাষ্ট্রভাষা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনটি চালিয়ে নেয়ার মহান প্রেরণা অনুধাবন করেছিলেন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি তখনকার প্রতিবাদী কণ্ঠ ছাত্র সংগঠন গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট- রওশন আরা বাচ্চু বলেন, গাজিউল হক, অলি আহাদ, আবুজাফর, ওবায়দুল্লাহ খান, হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ সুলতান, এস এম আলী, আব্দুল মতিন, সুফিয়া আলী, সোফিয়া খান, রওশন আরা বাচ্চু সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীদের সমম্বয়ে ১৯৫২ সালে, গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট গঠিত হয়। এটি রাষ্ট্রভাষা বাংলা আদায়ের জন্য অস্থায়ী সংগঠন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তখন অনেক সামাজিক বাঁধা বিপত্তি ছিল। ছাত্রীরা এসব উপেক্ষা করে বিভিন্ন মিছিল, সভা এবং গোপন সভায় অংশ গ্রহণ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহিস্কার করে দেয়ার ভীতি প্রদর্শন করতেন। কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন এই মর্মে অভিভাবকদের হুমকি দিতেন (এ ধরনের কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি)। সবকিছু উপেক্ষা করে তাঁরা সংগ্রামী ভাইদের সাথে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গোপন সভাগুলো হতো সেখানে রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন অল্পসংখ্যক ছাত্রী যথেষ্ট সাবধানতার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। সুফিয়া খাতুন, দেবি রায় ও রোকেয়া খাতুন সভায় তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতেন। তখন মেয়েদের হলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫/৩৬ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধিতেও তাঁরা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতেন। এখানে এসে রওশন আরা বাচ্চু বিশেষ একজন শিক্ষক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; তিনি বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. মুহম্মাদ শহীদুল্লাহ। যিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাঁর লেখনির মাধ্যমে। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ১৯৪৭ সালে ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

"কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দূ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদ গমনই হইবে। ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দূর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন যেমন-পশতু, বেলুচী, পাজ্ঞাবী, সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য"।[১]

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। উর্দূ/আরবী হরফে বাংলা লেখার একটি প্রচেষ্টা চলছিল। আরবী হরফে বাংলাভাষা শিক্ষা দানের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ভাষা সংস্কার কমিটির সদস্য ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫০ সালের ৪ অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[২] তখন স্ট্যাম্প ও মানি অডার ফর্মে উর্দূ ভাষায় হুকুমতে পাকিস্তান লেখা থাকতো। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর লেখনির দ্বারা রওশন আরা বাচ্চু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রওশন আরা বাচ্চু বলেন, যে দিন তিনি ভাষা আন্দোলনের ব্যারিকেড ভাঙ্গতে গিয়েছিলেন সেদিন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর ব্যারিকেডের সামনে পুলিশ বন্দুক নিয়ে বসে আছে। ব্যারিকেড ভাঙ্গার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক আগে থেকেই উপস্থিত হয়েছিল। রওশন আরা বাচ্চু উল্লেখ করেন, প্রথমেই ড. সুফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে চারজনের একটি দল ব্যারিকেড ভাঙ্গার জন্য গিয়েছিলেন। অন্যরা স্থির করলো তাঁরা কিভাবে ব্যারিকেড ভাঙ্গতে যাবে। এ উপলক্ষে আমতলায় তাঁদের একটা সভা হয়েছিল। ১৯৫২ সালে ২৭ জানুয়ারি

Dhaka University Institutional Repository
নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা ছাত্রসমাজকে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি ঘোষণা করলেন যে, 'উর্দূ', উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ করেছিল। সভার পরেই ঠিক হল শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সভা, মিছিল করে তেমন লাভ হবে না। আন্দোলনটা ঢাকার সমস্ত স্কুল কলেজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সে জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি পুনরায় সভার তারিখ নির্ধারিত হল। এই তারিখকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জড়ো করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার ঢাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়।[৩] এভাবেই আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য।

রওশন আরা বাচ্চুর কাছ হতে জানা যায়, সভার আলোচনার মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করেন, শুধুমাত্র ঢাকা শহরে আন্দোলনটা সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। প্রদেশব্যাপি এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে। তা না হলে এই আন্দোলন জোরালো হবে না।

আন্দোলন যথাযথভাবে চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় একটা টিনের কৌটায় কাগজ পেঁচিয়ে ভাষা আন্দোলন ফান্ড লিখে সবার কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে। এখানে প্রত্যেকে সামর্থ অনুযায়ী চাঁদা দিয়েছিল। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ফান্ড গঠন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট সভার আয়োজন করে। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাঁদের দাবিদাওয়াগুলো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এর মধ্যেই ঘোষণা করা হল ২১ তারিখে আইন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ঐ দিন তাঁরা একটা মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিটা জানিয়ে দেবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের দিন ২১ তারিখে গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট সেই মেমোরেন্ডামটা আইন পরিষদে পৌঁছে দেবেন। এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সভা শেষে সবাই চলে গেলেন। সন্ধার দিকে জানতে পারলেন ২১ তারিখ বেলা তিনটা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং এক মাসের জন্য শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ।[৪] তখন তাঁদের মধ্যে একটা বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফন্ট এতদিন পর্যন্ত (৩০ জানুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি) যে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে, সেগুলো সব বিফলে যাবে। ১৪৪ ধারা জারি করলে কোন সভা করা যাবে না। তাঁরা আইন পরিষদেও যেতে পারবে না।

রওশন আরা বাচ্চু সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন সভায়, মেয়েদেরকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এনে আমতলায় জড়ো করতেন; যাতে বাংলা ভাষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা জোরালো হয়। এভাবে স্কুল কলেজের মেয়েদের মধ্যে জাতিসত্তা, জাগরণ এবং চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ তারিখ সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুল ও ছাত্রী প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রী সংগ্রহ শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository
আমতলায় তাদেরকে একত্রে জড় করার জন্য। অন্যান্যদের মত রওশন আরা বাচ্চু বেরিয়ে পড়লেন ছাত্রী সংগ্রহ করার জন্য। বেলা ১০টা/১১টার দিকে সংগৃহীত ছাত্রছাত্রীসহ তিনি আমতলায় উপস্থিত হলেন। তিন ট্রাক পুলিশসহ একটা জীপ তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে সমবেত ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ছাত্রী সংগঠকদের সাথে ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছেন- বিশেষ করে বিকেলে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবে কি ভাঙ্গবেনা এ বিষয় নিয়ে ক্যাম্পাসের মধুর ক্যান্টিনে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচন্ড বাগবিতন্ডা চলছিল। ঐ সময় সমবেত জনতার সাথে তিনিও দেখলেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামছুল হক (জিন্না ক্যাপ মাথায় দিয়ে আর কালো শেরোয়ানি পরে) সকলকে বুঝাচ্ছেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। কারণ সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনের পরে শান্তিপুর্ণভাবে ভাষা আন্দোলনের দাবিদাওয়াগুলো আদায় করা যাবে। শামছুল হকের আপসবাদি মনোভাব তৎকালিন ছাত্রসমাজ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রওশন আরা বাচ্চু বলেন, শামছুল হককে ঐ অবস্থায় দেখে হাসান হাফিজুর রহমান (খ্যাতিমান সাহিত্যিক) হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। এক হাত দিয়ে শামছুল হকের গলার শেরোয়ানি ধরলেন আর অন্য হাত দিয়ে তাঁর মাথার জিন্না টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তিনি তাঁকে বললেন, এখানে তাঁর কোন কথা বলার অধিকার নেই। ছোটখাটো একটা ধস্তাধস্তির মত হয়েছিল এবং ছাত্ররা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এরপর তাদের মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মোয়াজ্জেম হোসেন এর সঙ্গে ড.জুবাইর উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা আগত ছাত্রছাত্রীদের বললেন যে, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা যাবে না। ১৪৪ ধারা কেন্দ্র করে বড় ধরণের বিপদ হতে পারে। মূলত; এ আশঙ্কা থেকেই তাঁরা সেখানে হাজির হয়েছিলেন। ছাত্র ছাত্রীরা তখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, যে কোনভাবেই তাঁরা রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন থেকে পিছাবে না, রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায় করেই ছাড়বে।

রওশন আরা বাচ্চু বলেন, ছাত্রসমাজের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের ফলে বেলা ১২টার দিকে গাজীউল হক এর (ভাষা সৈনিক) সভাপতিত্বে আমতলায় পুনরায় সভা শুরু হয়। সভা শেষে গাজীউল হক শামছুল হক কে বললেন যে, তাঁর ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার প্রস্তাবটা ছাত্রসমাজ কিছুতেই মানবে না। রওশন আরা বাচ্চু স্মৃতি থেকে বলেন, তখন সবাই উত্তেজিত। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মতিনকে বলা হল কিছু বলার জন্য। এ পরিস্থিতিতে মতিন কিছু বললেন না, গণতান্ত্রিক উপায়ে সকলের মতামত চাইলেন। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, তাঁরা কি চায়? তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবে কি না? উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী সকলে বললেন, আন্দোলন করবেন এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন। তখন গাজীউল হক বলে উঠলেন, যে যাই করুক বা যত কথাই বলুক নূরুল আমিন সরকার কত বারুদ রেখেছে তাঁরা সেটা দেখবেন। তাঁর (নূরুল আমিন সরকার) হুমকিতে ছাত্রসমাজ ভয় পায় না। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেনই এবং কেউ বললেন ৪জন, কেউ বললো ৫জন আবার কেউ বললেন ১০জন করে দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা তখন ছাত্র-ছাত্রীতে কানায় কানায় পূর্ণ। আব্দুস সামাদের নির্দেশ অনুযায়ী ১০জন করে বের হবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় ১০জন করে বের হলে যিনি প্রথমে থাকবেন তাঁকে আগে গ্রেফতার করা হবে, সেই পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সামাল দেবার জন্য প্রত্যেক দলের সামনে একজন করে ছাত্রী থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে কাঁরা হারিয়ে যাবে আর কাঁরা বেঁচে থাকবে সেই আশংকা করা হয়। যাঁরা ব্যরিকেড ভেঙ্গে মিছিলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে তাঁদের নাম তালিকাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। রওশন আরা বাচ্চু বলেন, মোহাম্মদ সুলতান সকলের নামের তালিকা করেছিলেন। ড. সুফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে চার জনের প্রথম দল বের হয়, এভাবে ২য় দলও বের হয়। কেউ লাঠির ব্যারিকেডের উপর দিয়ে গেল, কেউ লাঠির ব্যারিকেডের নিচ দিয়ে গেল। রওশন আরা বাচ্চু ছিলেন ৩য় দলে। তবে তাঁর দলে ১০ জনের বেশী ছিল। তিনি বলেন, আগের দলগুলো যখন ব্যারিকেডের উপর দিয়ে গেল, তখন তাঁদের একটা অংশকে ট্রাকে তুলে নেয়া হল। যাঁদের ট্রাকে তুলতে পারেনি তাঁরা শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেল, "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "রাজবন্দিদের মুক্তি চাই", "চল চল এসেমব্লি চল", "পুলিশি জুলুম চলবে না", ইত্যাদি। এসেমব্লিতে যাবার জন্য যে মেমোরেন্ডাম তৈরি করা হয়েছিল সেখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা, চট্টগ্রামে নৌসেনা দপ্তর ও একটা নৌ বন্দরের দাবীর উল্লেখ ছিল। ব্যারিকেড ভাঙ্গার প্রাক্কালে রওশন আরা বাচ্চু মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি লাঠির ব্যারিকেডের উপর দিয়ে যাবেন না এবং নিচ দিয়েও যাবেন না, ১৪৪ ধারার ব্যরিকেড ভেঙ্গেই যাবেন।

এক পর্যায়ে ব্যারিকেডটা ভেঙ্গে গেল আর এর পরই শুরু হল ব্যাপক লাঠি চার্জ। তিনি এ লাঠিচার্জের শিকার হলেন। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও তিনি থেমে থাকেননি কারণ তখন থেমে থাকার সময় ছিল না। তিনি আবারও মিছিলে অংশ নিলেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু সামনে এসেমব্লির (বর্তমান জগন্নাথ হল) কাছে ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। তাঁরা যখন শ্লোগান দিতে দিতে সামনের দিকে যাচ্ছিল, তখন টিয়ারশেল ছোড়া শুরু হল। গাজীউল হক অজ্ঞান হয়ে গেলেন। স্মৃতিচারণে রওশন আরা বাচ্চু বলেন, টিয়ারশেলের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। তাঁদের চোখ জ্বালা করছিল, লাল হয়েছিল এবং সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন এরকম আন্দোলনের সম্মুখিন তিনি এর আগে হননি। তবে কলকাতায় অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় টিয়ারশেলের ব্যবহার এর কথা তিনি শুনেছিলেন।

রওশন আরা বাচ্চু বলেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটার সময় গোলাগুলি শুরু হয়। তৎকালীন বহুল প্রচলিত পত্রিকা দৈনিক আজাদে বলা হয় "মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে সালাম, বরকত, রফিক,জব্বার- বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জনছাত্র সহ ৪ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। আন্দোলনে ছিলেন না এমন অনেকেও মারা যায় ".[৫] রওশন আরা বাচ্চু দুঃখ করে বলেন, ঐদিন তারও বাঁচার কথা ছিলনা। গুলি চালানোর চাক্ষুস সাক্ষী হয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন। বলেন, গুলি শুরু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট ড. ওসমান গনির বাড়িতে অনেকে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়েছিলেন। রওশন আরা বাচ্চু গেট পার হতে পারছিলেন না। নিজেকে বাঁচানোর জন্য

Dhaka University Institutional Repository
তিনি রেঁস্তোরার পাশে রিকশার স্তুপের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ সময় তার সামনে দিয়ে ব্যাপক গুলি চলছিল, তিনি কোন দিকে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না, স্তুপকৃত রিকশার পা দানির উপর উঠে লাফ দিলেন। লাফ দিতে গিয়ে রাস্তা এবং ওসমান গনি সাহেবের বাড়ীর মাঝখানে কাঁটাতারের যে বেড়া ছিল তার মধ্যে তাঁর শাড়ি আটকে গিয়েছিল। তিনি বলেন, হয়তো বা সেখানে কেউ জীবন বাঁচাতে লুকিয়ে ছিলেন, তিনি তার শাড়িটা ছাড়িয়ে দিয়ে প্রাণ বাচিঁয়ে ছিলেন, সেই মহান লোকটার খোঁজ তিনি আজও পাননি। গনি সাহেবের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে আগে থেকে অনেকেই সেখানে এসেছেন। ঐ পরিস্থিতির মধ্যে রওশন আরা বাচ্চুকে এখানে দেখে সবাই খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখন বাচ্চুর অচেতন অবস্থা, কেউ একজন ড. গনির বাড়ির ভিতর থেকে পানি এনে তাকে খাওয়ালেন। চেতনা ফিরে আসলে তিনি জানতে চান কার কি অবস্থা, কে কেমন আছেন। কারণ ঐ গুলিতে তাদের কতজন বেঁচে আছেন আর কতজন মারা গিয়েছেন তখনো কোন হিসাব নেই। গনি সাহেবের বাড়ি থেকে তিনি মাইকের ঘোষণা শুনতে পাচ্ছিলেন যে, আহতরা সবাই ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আছেন। ঐদিন সন্ধায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মাইক থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাতটায় মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ ছাত্রদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে ।[৬]

ড.ওসমান গনি সাহেবের বাড়ি থেকে রওশন আরা বাচ্চু লক্ষ্য করলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুনির চৌধুরী খুব চিন্তিত হয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। এই দৃশ্য স্মৃতিতে এখনো গেঁথে আছে। বিকাল ৪/৫টার সময় তিনি মুনির চৌধুরীর সাথে হোস্টেলে চলে আসেন। হোস্টেল সুপার আজিজুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে হোস্টেলের সিকরুমে রাখা হল এবং সে রাত সেখানে অবস্থান করতে হলো, রাতটি খুব কষ্টে অতিবাহিত করেছিলেন তা তিনি স্মরণ করেন। ঐদিন ছাত্রী হোস্টেলের অনেকেই মেডিকেলে গিয়েছিলেন আহতদের দেখতে ও নিজেদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিতে। কেবলমাত্র সুরাইয়া ডলি নামে একজন ছাত্রী হোস্টেলে ছিলেন। ঐদিন সারা রাত মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল যে, প্রচুর লাশ গুম করা হয়েছে। পরের দিন গায়েবানা জানাজা পড়ানো হয়ে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে অংশ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছিল। গায়েবানা জানাজার পর বিক্ষোভ আন্দোলন হবে সেই কথা ঘোষিত হচ্ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সেই জানাজায় সারা শহর থেকে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে।[৭]

সিকরুমে শুয়ে এগুলো শুনতে শুনতে রওশন আরা বাচ্চুর শরীর ও মন দুটোই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আজকালকার মত টেলিফোনের যোগাযোগ এত বেশী ছিল না। বাচ্চুর আত্মীয়রা ঐ সময় তার কোন তথ্য জানতে পারছিলেন না। পরের দিন পত্রিকার মাধ্যমে আত্মীয়রা ঢাকার পরিস্থিতি জানতে পারেন। বাচ্চুর ফুফা ঢাকায় চাকরি করতেন, সকালে তিনি তাঁর খোঁজ নিতে এসেছিলেন। এরপর ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল ফজিলাতুন্নেসা খাতুন ও তৎকালীন সাংসদ আমেনা খাতুন হোস্টেলে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository
রওশন আরা বাচ্চু বলেন, সিদ্ধান্ত মোতাবেক গায়েবানা জানাজার পর বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছিল। শহীদদের রক্তাক্ত জামাকাপড় লম্বা বাঁশের মাথায় বেধেঁ শুরু হয়েছিল জঙ্গি মিছিল। আর সেখানে পুরানো ঢাকার মহল্লার সর্দারগণ, বিশেষ করে কাদের সর্দার, মাওলা সর্দার, মতি সর্দার, পিয়ারু সর্দার এবং ইলিয়াস সর্দার সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তখনো ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। মিছিলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই এগিয়ে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন, কার্জন হল, হাইকোর্ট, ফজলুল হক হল, রেলওয়ে হাসপাতাল, রমনা রেষ্টহাউজ, রেলওয়ে ক্রসিং, নবাবপুরের পাইকারী বাজার, এসব এলাকা প্রদক্ষিণ করেছিল। রওশন আরা বাচ্চু বলেন, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক নারীর জীবনে বড় রকমের মাশুল দিতে হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম অন্যতম। তিনি শহিদের রক্তশপথে নারায়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। ফলে তাকে কারাবরণ করতে হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক, কারাগার হতে বন্ড সই করে মুক্তি লাভে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন। এতে করে তাঁর সংসারটি ভেঙ্গে যায়। নারায়ণগঞ্জের ইলা বকশী ও রেনুধরকে কারাবন্দী করা হয়।

১.১.১ পারিবারিক জীবন

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে, সিলেট বিভাগের মৌলবীবাজার জেলার কুলাউড়ার উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়ীতে রওশন আরা বাচ্চুর জন্ম । বাবা এ, এম, আশরাফ আলী এবং মা মনিরুন্নেসা খাতুন। রওশন আরা বাচ্চুর দাদা আমজাদ আলি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন এবং তৎকালীন সময়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন পদে অধিষ্টিত ছিলেন। রওশন আরা বাচ্চুর বাবা আশরাফ আলী ছিলেন প্রথম সন্তান। তিনি ছিলেন একজন সাব- রেজিস্ট্রার। ছোট চাচা মোদাচ্ছের আলী চাকুরী করতেন অডিট বিভাগে, কর্মস্থল ছিল শিলংএ। বাচ্চুর ফুপুরা সবাই শিলং এর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। বড় ফুপু মেহেরুন্নেসা নবম শ্রেণি আর ছোট ফুফু তাহেরা বানু দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সাব-রেজিষ্ট্রার হিসেবে তাঁর বাবা মাসিক ১৫০ টাকা বেতন পেতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বাবা গ্রামে ৫.৫ একর জমি পেয়েছিলেন। চাকুরী আর জমি থেকে আয় ছিল তাঁদের পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। তবে পঞ্চাশের ভূমি সংস্কারের ফলে তাঁর পরিবার অনেক জায়গাজমি হারিয়েছিলেন। সিলেটের ভানুগাছে ছিল রওশন আরা বাচ্চুর নানার বাড়ী। মামারা কেউ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, তাঁরা সকলেই ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে রওশন আরা বাচ্চুর মায়ের বিয়ে হয়। এরপরও তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।

রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জন্মেছিলেন রওশর আরা বাচ্চু। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর দাদা মুসলিমলীগ করতেন। ১৯১১ সালে তাঁর দাদা ছিলেন ঢাকায়। ঐ সময় তিনি নবাব সলিমুল্লাহর সাথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং নবাব সলিমুল্লাহর ভাল বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। আর এই বন্ধুত্বের কারণে নবাব সলিমুল্লাহ তাঁর দাদাকে দুটি কুকুর (ইয়াংকি ও মাংকি), একটি হাতির দাঁতের লাঠি ও একটি

Dhaka University Institutional Repository

বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। দাদার পর সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন তাঁর ছোট চাচা। তিনি কংগ্রেস পার্টি করতেন এবং অসহযোগ আন্দোলনেও অংশ নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তাঁর চাচা পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য শিলং টাউন হলে সুভাষ বোস এবং শরৎ বোস দুজনই বক্তৃতা দেয়ার জন্য আসেন। রওশন আরা বাচ্চু তখন শিলং লেডি কিং গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়তেন। তখন তাঁর চাচা তাঁকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে তাঁকে উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন যাতে তিনি তাদেরকে দেখতে পান। রওশন আরা বাচ্চু বলেন, "তখন আমি ছোট ছিলাম। বক্তৃতা বুঝার বয়সও তখন আমার ছিল না। তবুও আমি সুভাষ বোসের বক্তৃতা বুঝার চেষ্টা করেছিলাম। সুভাস বোস দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। আমার মনে হয়েছিল একজন দেবপুরুষ স্বাধীনতার মন্ত্র শোনাচ্ছেন- 'কদম কদম বাড়ায়ে যাও, খুশিয়ে গীত গায়ে যাও, জিনদেগি হ্যায় কত্তম কি, কত্তম পার লুটায়ে যাও' "। কথাটার অর্থ হলো, একপা একপা করে আগাও, খুশীর গান গেয়ে যাও, নিজেকে জাতির জন্য বিলিয়ে দাও, নিঃশেষ করে দাও। এর ফলে তাদের শিশু মনও সুভাস বোসের অনুসারী হওয়ার প্রেরণা পায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে তাঁর ফুপু অনেক কবিতা লিখতেন। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনেক ঘটনা ঘটত, এসব ঘটনাা বাচ্চুর বাড়ীতে আলোচনা হত যা ছোটবেলা থেকেই রওশন আরা বাচ্চুকে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত ছিলেন। রওশন আরা বাচ্চুর দাদার পরিবারের সকলেরই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমার্থন ছিল। তিনি এরকম রাজনৈতিক সচেতন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন।

১.১.২ শিক্ষা ও কর্মজীবন

রওশন আরা বাচ্চুর শৈশব কেটেছে সিলেটের কুলাউড়ায় বাবার বাড়ীতে। তিন বছর বয়সে বাচ্চুর হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর মায়ের কাছে। তাঁর মা ভাল বাংলা জানতেন। ৪ বছর বয়সে সিলেটের কুলাউড়া রেলওয়ে প্রাইমারী স্কুলে তাকে ভর্তি করানো হয়। স্কুলে তখন মোট ছাত্রী ছিল ১৫/২০ জন । সাবিত্রী দাস নামক একজন মহিলা শিক্ষক তাদের সমস্ত বিষয় পড়াতেন। বাচ্চু ছিলেন ঐ স্কুলের একমাত্র মুসলিম ছাত্রী। কুলাউড়া বিদ্যালয়ে পর্দা প্রথা মানা হতো না। এজন্য ৯ বছর বয়সে শিলং লাবাং প্রাইমারি স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে তাঁকে ভর্তি করা হয়। তিনি শিলংয়ে চাচা ও ফুপুর বাসায় থাকতেন। টিলার উপরে ৮২টা ধাপ পেরিয়ে বাসায় উঠতে হত। ফুপুরা ছিলেন রক্ষণশীল, বাচ্চু স্কুলে যাওয়ার সময় মাথায় কাপড় দিয়েছে কিনা ফুপুরা টিলার উপরে দাড়িয়ে দেখতেন। বাচ্চুর কাছে বিষয়টি ছিল অপছন্দের। একটু চোখের আড়াল হলেই তিনি মাথার কাপড় ফেলে দিতেন। ছুটির সময় তিনি কুলাউড়ায় বাড়ীতে আসতেন ।

স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, বাবার বাড়ীর সামনে বিরাট এক দীঘি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) ব্রিটিশ সৈন্যরা সেখানে ক্যাম্প করেছিল। এ সময় তিনি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তেন। চাকরির সুবাদে তাঁর বাবা ছিলেন বরিশাল। রওশন আরা বাচ্চু দুই এক লাইন ইংরেজী লিখতে পারতেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা

Dhaka University Institutional Repository
ইংরেজীতে কথা বলতে পারতেন। বাচ্চু তাঁর মায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী চিঠির মাধ্যমে ব্রিটিশ সেনা বাহিনী বরাবর অবহিত করলেন, তাঁর মা বাড়ীতে একা থাকেন। মায়ের দাবী পুকুর পাড়ে যেন কোনভাবেই আস্তানা করা না হয়। চিঠি পেয়ে মেজর সাহেব নিজেই তাঁদের বাড়িতে আসলেন। পর্দার আঁড়াল থেকে মেজর সাহেব তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বলেছিলেন, ক্যাম্পটি পুকুর পাড়ে করার অনুমতি দেয়া হোক, কারণ তাদের পানির খুব প্রয়োজন । মেজর সাহেব কথা দিয়ে ছিলেন, ক্যাম্পটি পরে সরিয়ে নেয়া হবে। কোন সৈন্য তাদের বাড়ীর কাছে এসে বিরক্ত করবে না। জবাবে তাঁর মা বলেছিলেন, সৈন্যরা সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত পানি নিতে পারবে।

শিলং লাবাং প্রাইমারি স্কুলেই রওশন আরা বাচ্চু প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করেন। এরপর ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন বরিশালের বেতাগী সরকারী বালক বিদ্যালয়ে। তাঁর বাবা তখন বরিশালের সাব-রেজিষ্ট্রার। এজন্য তিনি ঐ বালক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রওশন আরা বাচ্চু অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন শিলং লেডি কিংস্ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে। শিলং ছিল পাহাড়ী এলাকা, পাইন গাছের নিচে বড় বড় পাথরের উপর তাঁরা বসতেন। টিফিনের সময় কলেজের মেয়েরা এসে স্কুলের মেয়েদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের কুফল সম্পর্কে বলতো। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। যারাই বিদ্রোহ করছে তাদেরকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সূর্যসেন, হায়দারাবাদের নিযাম , ক্ষুদিরামের ফাঁসি, এগুলো সম্পর্কে তাঁদেরকে বলা হতো। এটাও আলোচনা হতো যে, ব্রিটিশদের হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে। তাঁরা সুভাস বোসের আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান জানাতো। তখন বাচ্চু বুঝতে পারেছিলেন, ‘কদম কদম বাড়ায়ে যাও, খুশিয়ে গীত গায়ে যাও’ এর অর্থ। এভাবে সুভাস বোসের মন্ত্র তাঁদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন দেশের জন্য তাঁরা কাজ করে। তিনি আরো বলেন, হিন্দু-মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ বিষয়টি ছিল। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, তখন হিন্দু ছাত্রী আর মুসলিম ছাত্রীর মধ্যে এই ভেদাভেদের বিষয়টি পরিস্কার বুঝতে পারতেন। ঐ সময় যদিও হিন্দু মুসলিম ছাত্রীরা পরস্পর খোঁজ খবর রাখত এবং পরস্পরের উৎসবগুলোতে আসাযাওয়া করতো, তবুও সেই সম্প্রীতির মধ্যেও এক ধরনের মানসিক দুরত্ব বজায় রেখে চলতো। মুসলিম ছাত্রীরা স্বরস্বতী পূজায় যেতেন কিন্তু হিন্দু ছাত্রীরা মহরমের অনুষ্ঠানে আসবেন কিনা তা বুঝতে পারেননি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ঐ সময় একজন মুসলিম ছাত্রী কলে পানি খেলে হিন্দু ছাত্রীরা সেটা ব্যবহার করত না। তারা বলতো, ‘ আমরা কল ছাড়ি আর তুই নিচ থেকে হাত পেতে পানি খা’। তাঁদের আচরণে এই অস্পৃশ্যতার বিষয়টি রওশন আরা বাচ্চুকে পীড়া দিত। তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন। সেদিন তাঁর স্পষ্ট জবাব ছিল যে, তাঁর কল ব্যবহার শেষে তারা যেন কল ধুয়ে পানি পান করে। সত্যিকার অর্থেই বাচ্চুর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই প্রতিবাদী মনোভাব কাজ করত যা ভাষা আন্দোলনেও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রওশন আরা বাচ্চু বলেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদার বোধ ছিল। লেডি কিংস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে খাসিয়া, নেপালী , খৃষ্টান , মুসলমান, নানা ধর্মে-বর্ণের ছাত্রী ছিল। অষ্টম শ্রেণিতে বাচ্চু

Dhaka University Institutional Repository

একা মুসলিম ছাত্রী ছিলেন, সেটি আমরা আগেই জেনেছি। পড়াশুনার বিষয়েও বাচ্চু বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন। শ্রেণির কাজ শেষে তিনি শিক্ষককে দেখাতে গেলে অন্য ছাত্রীরা তাকে মানা করতো। কিন্তু সেই বাধা উপেক্ষা করে আগেই ইংরেজী শিক্ষকের কাছে খাতা দেখাতেন। এ রকম একটা মানসিক জোর বাচ্চুর মধ্যে শৈশব থেকেই কাজ করত বলে তিনি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন।

রওশন আরা বাচ্চু বলেন, ব্রিটিশ আমলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতো এবং ভয়ও পেত। লেডি কিংস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সব শিক্ষকই ছিলেন মহিলা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী, সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। সেই সময়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রীতিলতাকে বাচ্চু খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তখন শিক্ষকদেরকে আদর্শ মনে করা হত। শ্রেণি পরীক্ষায় তাঁর স্থান ২য়/৩য়/১ম এরকমই থাকত। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, সেই সময় পর্দা নিয়ে আশেপাশের লোকজনের মনভাব নেতিবাচক ছিল না, যে যার মতো চলতো। হিন্দুরা হিন্দুদের মত আর মুসলমানরা মুসলমানদের মত চলতো। কেউ কারো ধর্মে আঘাত করতো না। “হিন্দু মহাসভা” যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন থেকে মুসলমানদের আলাদা করে ঘৃণা করার বিষয়টি শুরু হলো। হিন্দু মহাসভা ১৮৮২ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংস্থা। ১৯০৬ সালে এটি পাঞ্জাব সহ সব জায়গায় বিস্তার লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও হিন্দু কমিউনিটি গুলোকে একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি পালন করতো। এই মহাসভা বিস্তার লাভ করার পর ক্লাসে হিন্দু মেয়েরা বাচ্চুকে খুবই যন্ত্রনা দিত। সারাক্ষণ শুধু এটা ছুঁয়োনা, ওটা ছুঁয়োনা এসব বলতো। তারা বাচ্চুকে জিজ্ঞাসা করতো, স্কুলে যাওয়ার সময় সে খাওয়ার আগে কাপড় পরেছে, নাকি খাওয়ার পরে । বাচ্চু বলত, সে খাবার খাওয়ার পরে কাপড় পরেছে। কাপড় পরে খাওয়ার কাজ সম্পন্ন করে তাদের সাথে কথা বললে, তারা অসুচি হয়ে যাবে, আবার বাসায় গিয়ে গোসল করতে হবে। এছাড়াও তাঁদের বাসায় গিয়ে কিছু ধরতে গেলে তারা বাধা দিত। বাচ্চুর ভাষায় ঐ সময় যদি পাকিস্তান না হতো তাহলে তিনি এতদূর পড়াশুনা করতে পারতেন না। শুধু বৈষম্যের কারণে পাকিস্তান হয়ে বাঙ্গালী মুসলমানরা বেঁচে গিয়েছিল বলে বাচ্চু মনে করেন। মুসলমানরা কর্মক্ষেত্রে চাকরি পেল, বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল কিন্তু পাঞ্জাবিরা বাঙ্গালি মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দেয় নি। পাকিস্তানী শাসকরা এসেই লুটপাট আরম্ভ করল, ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরী হল। বাচ্চু ধারণা পোষণ করেন যে, অনেক পরীক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙ্গালির আজ এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ১৬ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পিরোজপুর কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তখন বাণিজ্য বিভাগ বলে আলাদা কিছু ছিল না।

যখন যুক্ত ভারত ছিল, তখন জিয়াউল হক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দি হবে ভারতের ভাষা, আর উর্দূ হবে পাকিস্তানের ভাষা। জিয়াউল হকের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন ড. শহিদুল্লাহ, এনামুল হক বাবর, জামান জাহেদী প্রমুখ। কোন জাতির অস্তিত্বকে বিলীন করতে চাইলে তার ভাষার উপর আঘাত করতে হবে। পাঞ্জাবি শাসক গোষ্ঠী এ কাজটি করেছিল। ৪ কোটি জনগণের

Dhaka University Institutional Repository
ভাষা অগ্রাহ্য করে তারা ঘোষণা করলো, একমাত্র উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার প্রতিবাদে জনগণ বিক্ষোভ করলো। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, তরুণ শিক্ষক আব্দুল হক, মাহফুজ জামান জাহেদী প্রমুখ বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দানের বিষয় পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন। কাজী মোতাহার হোসেন, ড. এনামুল হক, ফররুখ আহমেদ, আবুল মনসুর আহম্মেদ এই দাবিকে আরো জোরদার করেছিলেন। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

রওশন আরা বাচ্চু ১৯৪৭ সালে বরিশালের বি.এম কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি দীর্ঘ তিন বছর পড়াশুনা করেন। ঐ সময় পর্দা প্রথা ছিল, মেয়েরা শাড়ি পরতো এবং মাথায় কাপড় দিয়ে চলতো। তখন এত সালোয়ার কামিজের চল ছিল না। তিনি বি.এম কলেজের হোস্টেলে থাকতেন। কলেজের ছেলেমেয়েরা তখন একসাথে লেখাপড়া করতো। শ্রেণির মাঝখানে একটা পর্দা থাকতো। একপাশে ছেলেরা, অন্য পাশে মেয়েরা। সবাইকে পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে শিক্ষক বসতেন মাঝখানে। শান্তি সুধা ঘোষ নামে একজনই মহিলা শিক্ষক ছিলেন, তিনি গণিত পড়াতেন। বাকী শিক্ষকরা সবাই পুরুষ ছিলেন। বিষয় ভিন্ন হওয়ায় ঐ মহিলা শিক্ষককের সাথে বাচ্চুর কোন সম্পর্ক তৈরী হয়নি। কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে শান্তি সুধা তদারকি করতেন। তখনকার দিনে কলেজ শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের একটা দূরত্ব আর শ্রদ্ধার সর্ম্পক ছিল। তিনি বলেন কলেজের সব বিভাগেই অনেক শিক্ষক ছিলেন। ঐ সময় বি.এম কলেজে প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন, তাঁর মধ্যে ২ জন ছাত্রী , দু'জনই মুসলমান। ১৯৪৭ সালে বি.এম কলেজে কোন হিন্দু ছাত্রী ছিল না। কারণ শিক্ষিত হিন্দু জনগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিলেন অচিরেই দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে; ফলে তাঁরা সবাই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। বাচ্চু পড়তেন মানবিক বিভাগে। তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজী, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস। কলেজে পড়াকালীন কোন শিক্ষক দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। কলেজে পড়াকালীন তিনি কোন সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিলেন না তবুও বাংলা ভাষার উপর গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বি.এম কলেজের ছাত্ররা ভাষার পক্ষে একটি সভার আয়োজন করেন, রওশন আরা ঐ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, তিনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং কখনো কারাবরণ করেননি। তমদ্দুন মজলিসের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে লোক পাঠাতো, ভাষার ব্যাপারে বিভিন্ন খবর দিত, এ খবরগুলো একটা ছেলের মাধ্যমে বাচ্চু জেনে নিতেন। ঐ সময় তাঁর পরিবারে উর্দূ ভাষার ব্যবহার ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের প্যাইলি কিতাব, দুসরি কিতাব, তিসরি কিতাব ও চৌথি কিতাব পড়ার একটা রেওয়াজ ছিল, তাঁরা ফারসিও পড়তেন। স্মৃতিচারণে বলেন, তখন স্ট্যাম্প ও মানিঅর্ডার ফর্মে উর্দূ ভাষায় হুকুমতে পাকিস্তান লেখা থাকতো। হুকুমতে মানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের হুকুম। এই ঢেউ অব্যাহত থাকলে বাঙালী সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়বে বলে তৎকালীন বি.এম কলেজের ছাত্ররা মনে করতেন। তিনি বলেন, ঐ সময় তারা কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও ভালো বাংলা জানতেন। পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রশ্ন হতো এবং অনেকেই অনুশীলনী দেখে দেখে বাংলায় উত্তর দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সেই সব বইগুলো হারিয়ে ফেলেছেন। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে আপনি কেন ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে যুক্ত হলেন। গবেষকের এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইংরেজিতে পড়াশুনা করলে কি হবে, তিনি তো বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাংলায় আমাদের একটা আলাদা জাতিসত্তাও রয়েছে। সেই বোধ থেকেই তিনি সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রওশন আরা বাচ্চু ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

রওশন আরা বাচ্চু ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। তখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করলেই ভর্তি হওয়া যেত। বর্তমানের মত ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সেই সময় দর্শন বিভাগে শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ৬ জন, ৩ জন ছেলে আর ৩ জন মেয়ে কোন হিন্দু ছাত্রছাত্রী ছিলেন না। ছেলেদের মধ্যে একজন ছিল উড়িয়ার। দেশ ভাগ হওয়ার পর ওখান থেকেই পড়াশুনা করতে এখানে এসেছিল। সবাই মুসলমান হওয়ার কারণ ছিল ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ। হিন্দু মেয়েরা আগেই কলকাতায় চলে গিয়েছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৯ সালে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন হিন্দু ছাত্রী ছিল না। তবে পরের বছর থেকে প্রতিভা মুৎসুদ্দি তাদের বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। বাচ্চু মন্তব্য করেন, যখন তিনি প্রাইমারী ও হাইস্কুলে পড়তেন তখন হিন্দু মেয়েদের ব্যাপক দাপট ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরে সেটা আর লক্ষ্য করা যায়নি । রওশন আরা বাচ্চু WSR (Women Student's Residence) বর্তমান রোকেয়া হলে, থাকতেন। পড়াশুনার খরচ দিতেন তাঁর বাবা। তাঁর সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল ইতিহাস আর অর্থনীতি। দর্শন বিভাগে মাত্র ১জন মহিলা শিক্ষক ছিলেন; আখতার ইমাম। তাদের বিভাগে ৮/১০জন শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তি সময়ে অনেকেই মহিলা শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন।

১৯৫৩ সালে তিনি বি.এ পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট থেকে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবন শুরুর পর ৩০ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালে তাঁর বিয়ে হয় দিনাজপুর নিবাসী এস,এ ওয়াহেদের সঙ্গে। ঐ সময় তিনি কৃষি বিভাগে উপপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কর্মস্থল ছিল ঢাকায়। বিয়ের সময় এস,এ ওয়াহেদ এর বয়স ছিল ৪০ বছর। সরকারী কর্মকর্তা হওয়ার কারণে তিনি রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি কখনো বাচ্চুর রাজনৈতিক কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রওশন আরা বাচ্চু বলেন, বিয়ের পূর্বে স্বামীর সাথে তার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, তখনকার সময় এটা ভাবাও যেতনা। সম্পূর্ণ পারিবারিকভাবে বিয়েটি হয়েছিল। রওশন আরা কুলাউড়া গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন, তখন বি.এড পড়ার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। বি.এড, কোর্সের অংশবিশেষ প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিতে যান আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে । তার স্বামীর বোন ঐ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি তাকে পছন্দ করেন এবং বড়ভাই বিএস আব্বাসকে (তৎকালীন সময় ওয়াটার ডিপার্টমেন্টের কমিশনার) জানান। রওশন আরা বাচ্চুর এক ফুপাতভাই জামান তখন বি,এস আব্বাসের অধীনে পাওয়ার ডিভিশনে কাজ করতেন। বি এস আব্বাস জামানকে বলেন, বাচ্চুকে তাদের খুব পছন্দ হয়েছে, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। রওশান আরা বাচ্চুর পরিবারও সেই সময় পাত্র

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজছিলেন, উপযুক্ত পাত্র ভেবে তারাও দ্বিমত করেননি। দেবর এ.টি. বারী সক্রিয়ভাবে কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ডাকসুর সেক্রেটারী ছিলেন। তখন রওশন আরা বাচ্চু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বিয়ের আগে তাদের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না। তবে ডাকসুর সেক্রেটারী হিসাবে বাচ্চু তাকে চিনতেন। রওশন আরা বাচ্চু উইম্যানস রেসিডেন্স হোস্টেলে অর্থাৎ বর্তমান রোকেয়া হলে থাকতেন। এ.টি বারির সংযুক্ত হল ছিল সলিমুল্লাহ হল। ডাকসুর সমস্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম চলতো এই হল থেকে। তখনকার দিনে বিকেল ৫টার আগেই হোস্টেলের প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে যেত। সন্ধার পর ভেতরের দরজাও বন্ধ হয়ে যেত।

রওশন আরা বাচ্চুর শ্বশুর ছিলেন ইন্সপেক্টর অব পুলিশ। বাচ্চুর পরিবারের মতই জমিজমা ও চাকুরীই ছিল তাদের পরিবারের আয়ের উৎস। দিনাজপুরে প্রচুর জমিজমার মালিক ছিলেন তাঁরা। ১৯৫০ সালে ভূমি সংস্কারের ফলে তারা বাচ্চুর দাদার পরিবারের মত ক্ষতিগ্রস্থ হননি। রওশন আরা বাচ্চু ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকায় আনন্দময়ী স্কুল, লিটল এ্যাঞ্জেলস, আজিমপুর গার্লস স্কুল (খন্ডকালীন) নজরুল একাডেমি, কাকলি হাইস্কুল এবং আলেমা একাডেমি ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১.১.৩ আত্মোপলব্ধি

রওশন আরা বাচ্চু আত্মোপলব্ধিতে বলেন যে, সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পূর্বে রাজনীতি ছিল একরকম, বর্তমান রাজনীতি অন্যরকম। তখনকার সাথে বর্তমান সময়ের মিল অনেক কম। তিনি মনে করেন যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের উপস্থিতি স্বীকার করে না। যুগের পর যুগ মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে মানুষই বঞ্চিত করছে। ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত পূর্ববাংলার মানুষ ভাবতো, আরবী ও উর্দূ কোরআন শরীফের ভাষা তাই এর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। যখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ঠিক করলেন উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন পূর্ববাংলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়। রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হলে বাঙ্গালী জাতিসত্তা চলে যেতো। পূর্ববাংলার মানুষ উর্দূর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চেয়েছিল। কেননা মুখের ভাষাই যদি না থাকে ধ্যানধারণা যদি প্রকাশ করতে না পারা যায়, তাহলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হবে। রওশন আরা বাচ্চু বলেন, তিনি ইংরেজীতে পড়াশুনা করেছেন কিন্তু যখন নিজের ভাষার উপর এবং জাতীয় অস্তিত্বের উপর আঘাত করা হলো, তখন তিনি নিজেকে ভাষা আন্দোলনে নিবেদন করলেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তানের সরকারী মহিলা সমিতি আপওয়া সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। "পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী ছিলেন বেগম রানা লিয়াকত আলী। ১৯৪৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি তার নেতৃত্বে সমাজ সেবামূলক কাজ করবার জন্য এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা, রিফিউজি মেয়ে ও শিশুদের সাহায্য করা,

Dhaka University Institutional Repository
সেলাই এর কাজ ইত্যাদি সেবামূলক কাজ করা হতো"। এর বিপরীতে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এখানে রওশন আরা বাচ্চু অনেক সেবা মূলক কাজ করেছেন।

রওশন আরা বাচ্চু বলেন, "জাতির ক্রান্তিলগ্নে রাজনীতিবিদরা যখন মুখ থুবড়ে পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই তখন জাতির স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন"। জাতীয় ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে দেশবাসীর বিদ্রোহ অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামে নেতৃত্বদান করে গৌরবোউজ্জ্বল পতাকা সমুন্নত রাখেন ছাত্রসমাজ। মহান ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা জাতীয় ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। রওশন আরা বাচ্চু বলেন, মাতৃভাষার জন্য লড়েছি, সে দিনের রক্তক্ষয়ের চেতনা থেকেই আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পেরেছি, যার ফলে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। মহান একুশ আমাদেরকে শিখিয়েছে, মাথা নত না করতে, আপোষহীনভাবে অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। মাতৃভূমি বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ববাংলার আপামর জনতা বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী, মধ্যবিত্ত কেরানী, কর্মচারী আর শিক্ষক সবাই এই সংগ্রামের কর্মী। মূর্তিমান রক্তাক্ত আন্দোলনের স্বাক্ষর মহান একুশ। এই সংগ্রামে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন রওশন আরা বাচ্চু।

১.১.৪ মূল্যায়ন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মূলত: শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। পরবর্তিতে এটি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ ছিল অভাবিত। সে যুগে সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক খুব নাজুক ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের কথা বলা ছিল নিষেধ , প্রক্টরের মাধ্যমে কথা বলতে হত তা না হলে, ১০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হোস্টেল থেকে বের করে দেবেন, অভিভাবকরা লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন এমন আশংকা ও বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ছাত্রীদের মত রওশন আরা বাচ্চু আন্দোলনে অংশ নেন।

রওশন আরা বাচ্চুর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই আত্মমর্যদাবোধ কাজ করতো। তাঁর মা ছিলেন ভীষন সাহসী। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের বাড়ির সামনে ব্রিটিশ সৈন্যরা ক্যাম্প করেছিল। তখন বাচ্চুর মা তাদের কাছে চিঠি দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এতে করে কোন সৈন্য তাদের বাড়ির নিকটে এসে বিরক্ত করতো না। এরকম সচেতন মানসিকতা রওশন আরা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েছেন, তখন হিন্দু মেয়েরা তাকে কলে পানি খাওয়া নিয়ে অযথা বিরক্ত করতো। শিক্ষককে আগে খাতা দেখনো যাবে না বলে বিরক্ত করতো কিন্তু তিনি এ সব কিছুর প্রতিবাদ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে আত্মমর্যদা বোধটা কাজ করতো। তিনি যখন শিলং লেডি কিংস গার্লস স্কুলে ছিলেন, তখন কলেজের মেয়েরা টিফিনের সময় স্কুলের মেয়েদের কাছে আসতেন, ব্রিটিশ শাসনের কুফল সম্পর্কে ছাত্রীদের জানাতেন। সুভাস

Dhaka University Institutional Repository

বোসের দেশপ্রেম ছাত্রীদের ভিতর প্রসারিত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর পরিবারেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হতো।এভাবে তিনি স্কুল জীবন থেকেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন একজন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠেছিলেন।

রওশন আরা বাচ্চুর অবদান মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। বর্তমানের মত ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্ব ছিল না কিন্তু ভাষা আন্দোলনে তাদের সে দূরত্ব বাঁধা হয়নি। তাঁরা প্রয়োজনে গোপনে সভা করেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছেলেরা গোপনে এসে মেয়েদের কাছে জরুরি খবর পৌছে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উৎসাহিত করেছেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ছাত্রীদের বুঝিয়েছেন। অনেক সময় স্কুল প্রধান এ কাজে তাদের বাধা দিয়েছেন কিন্তু তার পরও রওশন আরা বাচ্চু বিভিন্ন কৌশলে কাজ করেছেন। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্কুলকলেজের ছাত্রীদের মানসিকভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাদের বুঝিয়েছেন সময়ের প্রয়োজনে কিভাবে অগ্রসর হতে হয়।

ভাষা আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। ভাষা আন্দোলনের ফান্ড গঠন করে তিনি এবং তাঁর সহপাঠিরা চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন সভায় অংশ নিয়েছেন। ছাত্রদের সঙ্গে একসাথে আন্দোলন করেছেন। এভাবে রওশন আরা বাচ্চু বাধাবিপত্তি পার করে ছাত্রীদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বি.এড পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, ১৯৬৫সালে তাঁর বিয়ে হয় এবং তখন তিনি সাংসারিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন আদর্শভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ভাষা আন্দোলনের পরের আন্দোলন ও সংগ্রামে তিনি সমর্থন দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেননি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। পরবর্তিতে তিনি তার কর্ম জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সময়ের পরিবর্তনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়, তিনি আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হননি কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও তার ধারাবাহিকতায় স্বাধীকারের জন্য বিভিন্ন জাতীয় সংগ্রাম ও বিপ্লব কেন্দ্রিক সভা ও অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে অংশ নেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে রওশন আরা বাচ্চু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন সফল নারী নেত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭, পৃ. ১

২. দৈনিক আজাদ, ৪ অক্টোবর, ১৯৫০, পৃ. ১

৩. দৈনিক আজাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১

৪. দৈনিক আজাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১

৫. দৈনিক আজাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১ ও ৩

৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ থেকে ১৯৭১*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০) পৃ: ৪৬০

৭. বদরুদ্দীন উমর, *পুর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকশনা.১৯৯৫) পৃ. ৩২৩ ও ৩২৪

৮. মালেকা বেগম, *বাংলা নারী আন্দোলন*, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯) পৃ: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৯. রওশন আরা বাচ্চু ০২-০৭-২০১৩, ০৬-০৭-২০১৩, ১০-০৭-২০১৩ এবং ১৬-০৭-২০১৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা করে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ড. হালিমা খাতুন

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাঁদের সাহসী পদক্ষেপ স্বমহীমায় মহীমান্বিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের মায়ের ভাষা, দেখিয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাদেরই একজন হলেন ড. হালিমা খাতুন। তিনি ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম, এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে (বর্তমান রোকেয়া হল) থাকতেন। রোকেয়া হলের নাম ছিল Women Student's Residence (WSR)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই ভাষা আন্দোলন আর কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত হন। ঐ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। ইংরেজী সাহিত্যে পড়ার সময় তার প্রিয় শিক্ষক ছিলেন সরোয়ার মুর্শিদ, মুনির চৌধুরী ও জ্যোতিরময় গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ শিক্ষকগণ। মুনির চৌধুরী প্রসঙ্গে ড. হালিমা বলেন, তিনি রাজনীতির সংঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুনির চৌধুরী কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন। ২১ ফেব্রুয়ারির পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি বন্দি হন।[১] তিনি তাদেরকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতেন। ড. হালিমা বলেন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় সরোয়ার মুর্শিদ বিলেতে ছিলেন। যাওয়ার আগে তিনি হালিমাকে বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী নুরজাহান মুরশিদ নির্বাচন করছে, তিনি যেন দেখাশুনা করেন। প্রিয় শিক্ষকের উৎসাহে হালিমা পুরোপুরি নির্বাচনের কাজে নেমে গিয়েছিলেন। মুসলিমলীগের পতনের জন্য গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচন করেছিলেন মিসেস সরোয়ার মুরশিদ। তিনি বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সংসদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন। ঐ সময় প্রচার প্রচারণায় হালিমা খাতুন ও তাঁর সহপাঠীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

হালিমা খাতুন ছাত্রী সংসদ এর সদস্য ছিলেন। তবে পুলিশি হয়রানির জন্য তিনি কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। ঐ সময় ছাত্রী সংসদের সহ সভাপতি (ভিপি) ছিলেন ড. সুফিয়া খাতুন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি প্রভৃতি পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অবদান রেখেছিলেন।

হালিমার কাছ থেকে জানা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি জুইফুল রায়, খোকা রায়,মোহাম্মদ তোয়াহা, ওমর সুলতান, কবির মোস্তফা এবং অলি আহাদের সঙ্গে গোপনে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। রোকেয়া রহমান কবির, লায়লা সামাদ, নিবেদিতা দাস প্রমুখ নারীদের সঙ্গে দলীয় সূত্রে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তিনি গোপনে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। একজন দলীয় কর্মী হিসাবে স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন ও দলীয় প্রচারকার্য চালাতেন। অন্যান্যদের মত হালিমার দায়িত্ব ছিল, স্কুল ছাত্রীদেরকে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। বিশ্বে ও সমস্ত দেশে যে রাজনৈতিক সংকট ও দুর্দশা চলছে সে সম্পর্কে অবহিত করা। এ সমস্ত কাজ তাঁরা করতেন গোপনে। এ কাজের জন্য তাদেরকে অনেক সাবধানে থাকতে হতো। স্কুলের বাচ্চাদের তাঁরা কোনভাবেই বুঝতে দিতেন না, যে তাঁরা কমিউনিষ্ট পার্টির অনুসারী। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীরা যেন রাষ্ট্রভাষার জন্য পিকেটিং, মিছিলে আর সভায় স্বত-স্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। এরপর আসে ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাস। স্মৃতিচারণে ড.

Dhaka University Institutional Repository

হালিমা বলেন, ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসটি ছিল প্রতিবাদ, প্রতিশোধ, আক্রোশ আর সংগ্রামের মাস। ২০ মে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস ৯৪, নবাবপুর রোডে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। বৈঠক চলতে থাকার সময়েই মাইক যোগে সরকারী ঘোষণা প্রচার করা হতে থাকে যে, ঢাকা জেলা মেজিস্ট্রেট ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। রেডিওর মাধ্যমেও ঐ একই ঘোষণা প্রচার করা হয়। এভাবে ১৪৪ ধারা জারির ফলে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সংগ্রাম কমিটির ঐ দিনের বৈঠকে ১৪৪ ধারা প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয়।[২] ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না এই নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। অধিকাংশই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, হোসেন, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ প্রমূখ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে এদের মূল যুক্তি ছিল এই যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে বিশৃংখলা ও সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এতে করে সাধারণ নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবার সম্ভবনা দেখা দেবে।

সরকার ১৯৪৭ সালের পর থেকে সাধারণ নির্বাচন দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন যদি আরো পিছিয়ে যায় অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। এছাড়া সারা দেশে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোন সাংগঠনিক কাঠামো প্রদেশব্যাপী গড়ে ওঠেনি। এজন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অসম্ভাব্যতার দিকটিও তাঁরা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। আব্দুল মতিন ও অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। তাঁরা বলেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোন অগ্রগতি তো হবেই না উপরন্তু তা ধ্বংস হবে।[৩]

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এই বিতর্ক চলাকালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' -এরও একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভা চলাকালে তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-১৯৪৭ সালের অক্টোবরে তমুদ্দিন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের অল্প কয়েকজন কর্মীও উপস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞাঁ।' সেই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি; কাজেই তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সর্বদলীয় পরিষদকেও সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[৪]

দ্রষ্টব্য ঃ- রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ- ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে, তমুদ্দিন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁঞা।

Dhaka University Institutional Repository
গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই বিতর্ক চলেছিল কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে কি হবে না, তার পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। এই কথার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়, তা হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলে ধরে নেয়া হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের এই বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় সর্বদলীয় পরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাত্রদেরকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিষয় অবহিত করবেন। সেই সাথে সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করবেন।[৫] পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি ২০ ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন, সকল ভাষার সমমর্যাদা ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন' এই সব শ্লোগান সম্বলিত সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করে।[৬]

সঠিক সময়ে ছাত্রীরা বাধা উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় উপস্থিত হতে পারবে কিনা- এই বিষয়টি নিয়ে ২০ তারিখে হালিমা খাতুন খুব চিন্তিত ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল মুসলিম গার্লস স্কুল আর বাংলা বাজার গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আসার। তিনি আরো জানান, হোস্টেলে অবস্থানরত মেয়েদের সর্ম্পকেও অনিশ্চয়তা ছিল, কারণ মফস্বল শহর থেকে অনেকেই তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন মাত্র। হালিমার অনুরোধ হোস্টেলের ছাত্রীরা শুনবেন কিনা বা তাঁরা সভা সমাবেশ ও মিছিলে যাবেন কিনা সে ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট শংকা ছিল। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম নাদেরা বেগমের কথা চিন্তা করলেন (নাদেরা বেগম ১৯২৯ সালে বগুড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিট্রেট ছিলেন। মা আফিয়া বেগম। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম,এ পাশ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কবির চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরী তাঁর বড় ভাই।))। চিন্তা অনুযায়ী রাত্রেই হালিমা একজন স্থানীয় অভিভাবককে সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন হাতিরপুলে নাদেরা বেগমের বাসায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে হালিমা তাকে অনুরোধ করলেন যে, হোস্টেলের মেয়েদেরকে পরের দিন আমতলায় মিটিং-এ সমবেত হবার জন্য তিনি যেন তাদের বরাবর একটা চিঠি লিখে দেন। হালিমার কথা মত নাদেরা বেগম হোস্টেলের মেয়েদের পরের দিন অনুষ্ঠিতব্য আমতলায় মিটিং-এ সমবেত হবার জন্য চিঠি লিখে দিলেন। তবে চিঠি নিয়েও বিশেষ কাজ হয়নি কারণ পরের দিন সকালে মাত্র তিন চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাড়া আর কেউ পথে বের হলেন না। সবার নাম আজ হালিমা খাতুনের আর মনে নেই, তবে সুফিয়া খাতুন ও সোফিয়া খানের নাম তাঁর মনে আছে। স্মৃতিচারণে হালিমা বলেন, ছাত্রী সংগ্রহের জন্য তিনি প্রথমেই গিয়েছিলেন বাংলা বাজার স্কুলে। ওখানকার ছাত্রীদের রওয়না করে দিয়ে তিনি যান মুসলিম গার্লস স্কুলে। এ স্কুলের ছাত্রীদের সাথে নিয়ে তিনি সরাসরি আমতলায় এসে সমবেত হয়েছিলেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

আমতলায় এসে দেখলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে একাকার হয়ে গেছে। অতঃপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, তাঁরা পাকিস্তান সরকারের জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন না, সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। সমবেত জনতার অধিকাংশই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি বেশ সকাল থেকেই ছাত্ররা ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং-এর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। নবাবপুর এলাকায় পিকেটিং শুরু করার পর আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ ইত্যাদি পার্টির যারা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিল, তাদের সঙ্গে পিকেটিংরত ছাত্রদের নবাবপুরে একটা সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা বিস্তার লাভ করার আগেই ছাত্রসহ সবাই পিকেটিং বন্ধ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফিরে যায়। সকাল ৯ টা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শহর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এসময় অসংখ্য পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বিশেষ করে তৎকালীন কলাভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়। পুলিশের এ সমাবেশ দেখে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭]

সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর।[৮]

সভা শুরু হবার পর, শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়াও মোহাম্মদ তোয়াহা ও খালেক নেওয়াজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গেলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতেই হবে। অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকলেও তিনি সভায় এ বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখেননি। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে চান কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা নিয়ে এমন কোন বিতর্ক শুরু না হয় যাতে করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়।[৯]

ঘন্টা খানেক সভা চলার পর গাজীউল হক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য সভার পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে স্থির হয় যে, দশ জন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। অন্যথায় সবাই একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার

সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয়।[১০]

ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি নেয়ার সময় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গকালে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কিছু পিকেটিং হয়। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে সমবেত ছাত্রদের দিকে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গেটের বাইরে গেলে পুলিশ অনেককেই গ্রেফতার করে গাড়িতে করে ঢাকার বাইরে কিছুদূর নিয়ে ছেড়ে দেয়। একটি মোটা রশি দিয়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ রাখার চেষ্টা করে কিন্তু বেলা ১২টা থেকে ছাত্ররা সেই রশির বাধা পার হয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে যেতে থাকে। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটি তখন ছিল তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভা ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হলের) একেবারে কাছাকাছি। মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চারদিকে মোতায়েন করা পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং উভয় দিকে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এলাকাতেও ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। লাঠিচার্জ করার উদ্দেশ্যে হোস্টেলের ভিতরে প্রবেশ করে। ছাত্ররাও তখন পুলিশের দিকে বেশি করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে।[১১] এভাবে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা প্রায় ৩ টার দিকে পরিস্থিতির বেশ অবনতি ঘটে। এই সময় পুলিশের ডি আই জি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টসহ অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারি আমলা ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ছাত্ররা পিছু হটতে অস্বীকার করে, ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকলে তাঁদের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে দু'একবার সতর্ক করে দেয়া হয় কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এরপর ছাত্ররা পিছু হটে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেডগুলোর (এই শেডগুলো মেঝে এবং দুই ফুট পর্যন্ত দেওয়াল পাকা, দেওয়ালের বাকি অংশ বেড়া এবং ছাদ টিনের ছিল) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেডের দেওয়াল বেড়ার তৈরি হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। এই সময় চীৎকার করে কেউ কেউ বলেন যে, পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আওয়াজ করছে। ছাত্ররা এই কথা শোনার পর দলে দলে শেডগুলো থেকে বের হয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে । তাঁদের একটা অংশ গেটের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময়ই পুলিশ আরেক দফা গুলিবর্ষণ করে। এবার তারা ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করেই অনেক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং সেই গুলিতেই বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র হতাহত হয়![১২]

গেটের সামনেই একজন ছাত্রের মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। তাঁকে পার্শ্ববর্তী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আবুল বরকত নামে আরেকজন ছাত্র ১২ নম্বর শেড থেকে বের হওয়ার সময় পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যান এবং ক্ষতস্থান থেকে ভয়ানক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অতিরিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রক্তক্ষরণের ফলে সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে আবুল বরকতের মৃত্যু ঘটে। এ সংঘর্ষে কম-বেশি আহত হন প্রায় ষাট জন ছাত্র। এদের অধিকাংশকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। একজন সেদিনই সন্ধ্যা বেলায় মারা যান। ২১ ফেব্রুয়ারিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় চার।[১৩]

২১ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছাকাছি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভার সদস্যরা পরিষদ ভবনে যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়ই ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলির আওয়াজ সেখান থেকেও শোনা যায়। গুলি করার কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যেদিকে পরিষদ ভবন অবস্থিত সেদিকে সমবেত হয়। এরপর পরিষদ সদস্যদেরকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য চিৎকার করে আহ্বান জানাতে থাকে। এ সময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ হট্টগোল শুরু হয়। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ স্পীকারকে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন যাতে করে তাঁরা সকলে বাইরে যেতে পারেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমিনকে বলেন যে, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ মেডিকেল হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেয়া। নূরুল আমিন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি করেন। কিন্তু নূরুল আমিন বিরোধী পক্ষের দাবি অগ্রাহ্য করে নিজের বিবৃতি দিতে শুরু করেন। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্ককাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদ ভবন ত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন।[১৪] মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় মাইক বসিয়ে ছাত্ররা আগে থেকেই বক্তৃতা করছিলেন। গুলিবর্ষণের পর তাদের সেই বক্তৃতায় স্বাভাবিকভাবেই সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছিল। আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদভবন থেকে বের হয়ে আসার পর তাঁকে হোস্টেলের ভিতরে মাইকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।[১৫]

হালিমা খাতুনের কাছে এ সম্পর্কে জানা যায় যে, বিশেষ করে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে সভার সিদ্ধান্তটি কোনভাবেই মেনে নিতে চাইলেন না। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে প্রতিরোধকারী পুলিশ বাহিনীকে বুড়ো আঙ্গুল প্রদর্শন করলো। ব্যাপক হট্টোগোল শুরু হয়ে গেল। সম্মিলিত ও জোরালো প্রতিবাদের ফলে সভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হলো। তাঁরা ঠিক করলেন, যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। প্রয়োজন বোধে চারজন চারজন করে মিছিল নিয়ে পুলিশ ব্যারিকেডকে উপেক্ষা করবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপস্থিত সকল ছাত্রীরা প্রথমেই দলে দলে বের হলেন। প্রথম দলে ছিল তিনটি স্কুল থেকে আগত তিন ছাত্রী (পারুল, সেতারা ও নুরী) ও হালিমা খাতুন। আইন অমান্যকারী হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে পুলিশ বাধা দেয়নি। তবে তৃতীয় দলকে বাধা দেয় ও তাদেরকে বন্দী করে গাড়িতে তুলে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় বলে হালিমা জানান। মেয়েদের আটক করতে দেখে ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে বের হতে থাকলো। পুলিশ তখন প্রচন্ড রকম টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে, সবার চোখ মুখ জ্বালাপোড়া করে। কাঁদতে কাঁদতে আর শ্লোগান দিতে দিতে

Dhaka University Institutional Repository
হালিমাসহ অন্যরা এগিয়ে যেতে থাকেন এ্যাসেমব্লি ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) দিকে। শুধু টিয়ার গ্যাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না, পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ উভয় এক সাথে চালাতে শুরু করে। তবুও সম্মিলিত ছাত্রসমাজ সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। আবার একটু সামনে এগিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন ভলান্টিয়ার বালতিতে করে পানি ভরে নিয়ে আক্রান্তদের সাহায্য করছে। হালিমা তখন রুমাল আর শাড়ির আঁচল পানিতে ভিজিয়ে চোখে দিতে লাগলেন, যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে যন্ত্রণাটা দূর হয়। তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন যে, চোখের সামনেই টিয়ার গ্যাসের বড় বড় শেল এসে পড়ছিল। তিনি ভয়ে ঢুকে পড়লেন মেডিকেল কলেজের ভেতরে। মেডিকেল কলেজের মধ্যে তখন নির্মাণ কাজের জন্য প্রচুর ইট জমা করে রাখা হয়েছিল। হাসপাতাল চত্বরে তখন অনেক ছাত্র জনতা। তার মধ্যে ছাত্রই ছিল বেশী। রাস্তায় তখনও পুলিশের ভয়ানক লাঠি আর টিয়ার গ্যাস চলছিল। মারমুখী পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে, মেডিকেলের ভেতর থেকে ছাত্ররা ইট ছুড়তে শুরু করে দিল। সুলতান-উজ-জামান ও আরো অনেক পরিচিত ছাত্রকে হালিমা সেখানে দেখতে পেলেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য সেখান থেকে দ্রুত সরে যেতে বললেন, কারণ তখন পুলিশ আবারো গুলি করতে শুরু করেছে। তিনি ইমার্জেন্সীর দিক থেকে আহতদের আর্তনাদও শুনতে পাচ্ছিলেন। হালিমাসহ কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে সেদিকে গেলেন। দেখলেন যে, স্ট্রেচারে করে অনেক আহত ছাত্রদের নিয়ে আসা হচ্ছে, অনেকেরই শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওয়ার্ডে গিয়ে হালিমা দেখলেন, আহত মানুষে ওয়ার্ড ভরে গেছে। সেদিনের আহত মানুষদের ভয়াবহ আর্তনাত এখনও যেন তার কানে অনুরণিত হয়। তিনি ঐদিন প্রায় সারাদিনই মেডিকেল কলেজে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় হালিমা হোস্টেলে ফেরার সময় পথে একজন স্কুল ছাত্রের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, পাশেই পড়ে ছিল তাঁর পাঠ্যপুস্তক। তিনি আরো বলেন, ভাষার জন্য আন্দোলন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। সব কিছু উপেক্ষা করে ভাষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই অর্জন জাতির জন্য অনেক বড় অর্জন।

১.২.১ পারিবারিক ও কর্মজীবন

ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় নারীদের মধ্যে হালিমা খাতুন ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৩ সালের ২৫ আগস্ট খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলা, বাগেরহাট সদর থানা, বাদেকাড়াপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাদেকাড়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মনমোহিনী গার্লস স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে, বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫১ সালে ডিগ্রী পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম,এ পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। খুলনা করোনেশন স্কুলে ১৯৫৩ সালে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৫৫ সাল হতে রাজশাহী গার্লস কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সাল

Dhaka University Institutional Repository
পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। হালিমা খাতুন জাতিসংঘের উপদেষ্টা হিসেবে ২ বছর (১৯৭৭-৭৯) দায়িত্ব পালন করেন। গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুন ছাত্রী হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল হালিমা খাতুনের। হালিমা খাতুনের বেড়ে ওঠা, শৈশব, কৈশর, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা স্মৃতি সরেজমিনে তাঁর ভাষায় লিপিবদ্ধ করার জন্য সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৩ তে ৫ দফায় একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে রচিত কেসস্টাডির নানা দিক এই গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন ছাত্রীর সঙ্গে তিনি ছাত্রী নিবাসে (বর্তমান রোকেয়া হল) থাকতেন। ২৯ জনের মধ্যে অল্প কয়েকজন, বিশেষ করে সোফিয়া খান, রোকেয়া খাতুন, হোসনে আরা জুলি এমনকি তিনি নিজেও কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন। তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় নানা সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন, সরাসরি বিভিন্ন সভা ও মিছিলে অংশ নিতেন। বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের সভা ও মিছিলে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হালিমা গোপনে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কলেজ জীবন থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। তখন পার্টির সর্বমোট ৯০ হাজার সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশেই ছিল ২২ হাজার। তার মধ্যে পূর্ববাংলায় সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ হাজারের উপরে।[১৬] ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, বাংলার স্বাধীনতার জন্য, ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। হালিমার জন্মভূমি বাগেরহাটের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়। সেখানে কংগ্রেস পার্টিও ছিল বেশ শক্তিশালী। ঐ সময় তার চাচা সম্পর্কীয় খন্দকার উকিল উদ্দীন পেশায় ছিলেন একজন উকিল, তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। শৈশব থেকেই হালিমা এই চাচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হালিমা খাতুনের বাবার নাম মৌলবি আব্দুর রহিম শেখ এবং মায়ের নাম দৌলতুননেসা। বাবা কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি গুরু ট্রেনিং স্কুলে (বর্তমান পিটিআই) শিক্ষকতা করতেন। হালিমার দাদার নাম লস্কর উল্লাহ, গৃহস্থালী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। হালিমার ৩ চাচা ও ৩ ফুপু ছিলেন, বড় চাচা পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করতেন, অন্য চাচারা হাইস্কুল শেষ করে জমিজমা দেখাশুনা করতেন। ফুপুরা সবাই গৃহিণী। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হালিমা বলেন, তিনি প্রথমদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তিনি এই পার্টিতে যোগ দেন। বাবা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করতেন না তবে কংগ্রেস পার্টিকে সমর্থন করতেন। তিনি পন্ডিত মানুষ ছিলেন, আরবী ও ফারসীতে তার অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। পরিবারের সবাই ছিল সংস্কৃতিমনা। হালিমা খাতুনের চাচাদের কবি গান, জারিগান, সারিগান ও নাটকের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। মৌলবি আব্দুর রহিম শেখ বাড়ীর সবাইকে

Dhaka University Institutional Repository
গ্রামের মানুষের সাথে শুদ্ধভাষায় কথা বলতে উপদেশ দিতেন এবং নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করতেন। ঐ সময় বাগেরহাট কলেজের ছাত্ররা আশেপাশের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গীর থাকতেন। তাঁদের বাড়িতেও সবসময় একজন করে কলেজ ছাত্র জায়গীর থাকতেন। বাড়ীতে ফুটবল খেলা হত, ম্যাগাজিন তৈরী হতো এবং বিভিন্ন গল্পের আসরও বসতো। তাঁদের বাড়ী থেকে হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করা হত, ম্যাগাজিনটা ছিল একেবারে পত্রিকার মত, ছোট ছোট করে লেখা হতো। তাদের বাড়ীর সবাই এবং আশে পাশে জায়গীররা মিলে পত্রিকাটি বের করতেন। ঐ সময় তাঁদের পরিবারের কেউ ঢাকায় চাকরি করতেন না, দুলাভাই ফকীর জনাব আলী কলকাতায় চাকরি করতেন।

হালিমারা চার ভাই ও সাত বোন, তিন ভাই শৈশবে মারা গিয়েছেন, বর্তমানে সাত বোন ও এক ভাই। বড়ভাই হাকিম খেলাধূলা ও শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি মাট্রিক পাশ করেননি তবে, কলকাতায় চাকরি করতেন। পরে তিনি কলকাতার চাকরি ছেড়ে পোস্টমাস্টারের চাকরিতে যোগ দেন। বোনদের মধ্যে মাহমুদা কেবল ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। মেজবোন জাহানারা প্রচুর বই পড়াশুনা করতেন। হালিমা বলেন, খুব ছোট বয়সে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' -এর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন; শীতের সকালে রৌদ্রে বসে যখন ভাই বইটি পড়তেন তিনি মনযোগ দিয়ে শুনতেন।

বইটি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী, তখনকার সময়ে বইটি পড়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'পথের দাবী' তার জীবনকে বেশ প্রভাবিত করেছে। হালিমার দুলাভাই কলকাতায় রাইটারস বিল্ডিং এ কাজ করতেন। এরপর তিনি 'আজাদ' ও 'নবযুগে' কাজ করেছিলেন। তাঁর দুলাভাই কলকাতা থেকে তাঁদের জন্য গল্পের বই ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পাঠাতেন। তিনি কলকাতা থেকে বেড়াতে আসলে অনেক গল্প শুনাতেন। হালিমার দুলাভাই-এর বাড়িতে একটা বিশাল লাইব্রেরি ছিল। হালিমা দুলাভাই এর বাড়ীতে গেলে ঐ লাইব্রেরিতে বই পড়তেন। এ ধরনের পরিবেশে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন তার জীবনকে প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে দুলাভাই, চাচা উকিল উদ্দীন ও কলেজের শিক্ষকদের অবদান রয়েছে।

হালিমার নানার বাড়ি ছিল দাদার গ্রাম থেকে ২-৩ মাইল দূরে পাটোর পাড়া গ্রামে। তাঁর নানার ছিল ৭ মেয়ে ও ৩ ছেলে। নানার নাম শেখ আহম্মদ আলী ও নানীর নাম লালুবিবি। নানা ছিলেন জমিদারের নায়েব। নানী লেখাপড়া না জানলেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। হালিমার মা কখনো স্কুলে যাননি, বাড়িতেই বাংলা পড়ালেখা শিখেছিলেন, কোরআন শরীফও পড়তে পারতেন। বড় মামা আবদুল বারীও ছিলেন নায়েব, তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন। মেজো মামা শহীদ, তিনি ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসা থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী নিয়ে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ছোট মামা আব্বাস, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কালেক্টরেট এ চাকরি করতেন। নানার পরিবারের কেউ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না তবে মেজো মামা ঢাকা থেকে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন, ঢাকার অনেক খবর ও গল্প শুনাতেন।

হালিমা এম,এ, পাশ করার পর ১৯৫৫ সালে ২৩-২৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর নাম শামসুল হুদা, পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে হালিমা

Dhaka University Institutional Repository
খাতুনের একমাত্র মেয়ে প্রজ্ঞালাবনীর জন্ম হয়। প্রজ্ঞালাবনী এম.এ এবং এম.বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডেফোডিল, ইউনিভাসিটি অব লিবারেল আর্টস, শান্তা মারিয়াম) অধ্যাপনা করছেন। তিনি মিডিয়াতে উপস্থাপনা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের তদারকি করেন। শ্বশুর বাড়ির প্রসঙ্গে হালিমা বলেন, ভাসুর ছিলেন প্রথম ব্যাচের সি.এস.পি অফিসার জনাব মুহাম্মদ মুসা। হালিমা খাতুন ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি, স্বামীর পরিবারও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল।

১.২.২ শিক্ষাজীবন

হালিমার শৈশব কেটেছে গ্রামে। তাঁর কথা বলতে শেখার পর শুরু হয়েছিল কবিতা পাঠের চর্চা। অন্যান্য বাচ্চাদের মত তিনিও আনন্দঘন পরিবেশে তাঁর শৈশবটি কাটিয়েছিলেন। স্কুলে যাবার আগেই বাসায় তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল। তিনি স্কুলে যেতেন হাতে তালপাতা নিয়ে , তালপাতায় তিনি লিখতেন। সেই সময় মাটির দোয়াত কিনতে পাওয়া যেত। তার মধ্যে কয়লা ও পানি মিশিয়ে কালি বানানো হতো। বাঁশের কঞ্চির কলম দিয়ে তালপাতায় লিখতে হতো। প্রথম শুধু দাগ কাটা আর হাঁড়িপাতিল আকাঁ। তারপর ওস্তাদজী লোহা দিয়ে তালপাতার উপর স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলো লিখে দিতেন, সেটার উপর দাগ দিয়ে লিখতে হতো। যখন এই তালপাতায় বর্ণমালা, বানান, নামতা বা শতকিয়া লেখার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হতো তখন অনুষ্ঠান করে কাগজ দিয়ে লেখা আরম্ভ করতে হতো। এটাকে বলা হতো "কাগজ ধরা" অনুষ্ঠান। স্কুলের কাগজ ধরা অনুষ্ঠানে একপাতা কাগজ এক ইঞ্চি সমান ভাজ করে ওস্তাদজী প্রথমে লিখে দিতেন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম', সেটা দেখে দেখে লিখতে হতো। "কাগজ ধরা" অনুষ্ঠানের দিনে স্কুলে মিষ্টি নিয়ে যেতে হতো। কাগজ, মিষ্টি আর একটা রূপোর টাকা ওস্তাদজীকে সম্মানী হিসেবে দেওয়া হতো। দেখে দেখে লেখার কাজ সম্পন্ন হলে ওস্তাদজীকে টাকাটা দেয়া হতো। আর কাগজে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখাটা পানিতে ফেলে দিতে হতো। তারপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাগজে লেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যতদূর হালিমা খাতুনের মনে পড়ে, তালপাতায় আঁকাআঁকি করার প্রথম ৫-৬ মাস প্রিস্কুল বা শিশু শ্রেণি এবং কাগজ ধরা শুরু থেকে প্রথম শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হতো।

হালিমার স্কুল জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বাদেকাড়া পাড়া প্রি প্রাইমারী স্কুলে, স্কুলটা তাঁর বাবা আব্দুররহিম শেখ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, গ্রামে অন্য কোন স্কুল ছিল না। স্কুলে ৩০-৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল, ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০−১২ জন। ছাত্রীরা সবাই ছিল মুসলিম, অনেকের নাম আজও তাঁর মনে আছে, কয়েক জনের সাথে আজও ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলে তিনি জানান। প্রাইমারি স্কুলে তিনি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিলেন, স্কুলে কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন ৰা। পাঠ্য বিষয় হিসেবে ছিল, বাংলা, ইংরেজি, অংক আর ভূগোল। স্কুলে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনা করত। স্কুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, দু'টো ঘর মিলে ছিল একটা হল ঘর, ঘরটি ছিল মাটির তৈরী। যে স্কুলে আসত না তাঁকে ধরে আনার জন্য বড় ক্লাসের ছাত্রদের পাঠানো হতো। শনিবারে পুরানো পড়া বলতে হতো। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হালিমা বলেন তাঁদের গ্রামের স্কুলে সবাই ছিল মুসলিম, একটাও হিন্দু পরিবার ছিল না। তবে পাশের গ্রামের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার,একঘর বা দু'ঘর হয়তবা ছিল মুসলমান । পড়াশুনায় হালিমা ভালোই ছিলেন, স্কুল হতো দু'বেলা। সকালে শুধু কয়লার কালি দিয়ে লেখা, লেখা শেষ হলে ১২ টার সময় ছুটি হয়ে যেত। পুনরায় বই নিয়ে বিকাল বেলায় স্কুলে যেতে হতো। অর্থাৎ স্কুল মানেই সকাল বেলায় লেখা আর বিকাল বেলায় পড়া। প্রাইমারি স্কুলে তখন উর্দূও পড়ান হতো। তিনি বলেন, প্রাইমারি শিক্ষা দু'স্তরে বিভক্ত ছিল, লোয়ার প্রাইমারি (এলপি) এবং আপার প্রাইমারি (ইউপি)। লোয়ার প্রাইমারি মানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি । তৃতীয় শ্রেণিতে তিনি বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বৃত্তি পরীক্ষা মানে ইন্সেপেক্টর এসে স্কুলে বসে পরীক্ষা নিতেন। সেখান থেকে লোয়ার প্রাইমারি সম্পন্ন না করে তিনি বাগেরহাট শহরের স্কুলে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। কারণ তাঁর বোনরা সবাই শহরে পড়াশুনা করতেন। তাছাড়া ঐ সময়ে গ্রামের স্কুল থেকে শহরের স্কুলে ভাল পড়াশুনা হতো। গ্রাম থেকে হেঁটে হেঁটে তিনি আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত শহরের স্কুলে যেতেন। অনেক সময় গ্রামের লোকেরা বাঁধা দিত এই বলে যে, মৌলবি সাহেব কেন মেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন। গ্রামের লোকেরা এমনও হুমকি দিতেন যে, মৌলবি সাহেবকে (তাঁর বাবাকে) একঘরে করা হোক। বাস্তবে মৌলবি সাহেবকে একঘরে করেও রাখা হয়েছিল। তাঁর বাবা বলেছিলেন যে " কোরআন কেতাবেই তো আছে যে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হয়, তোরা ব্যাটা মূর্খ! তোরা কি জানিস!, তোদের সঙ্গে তো আমি খেতেপরতে যাচ্ছি না"। হালিমার বড়বোন কলকাতার হাওড়ায় স্কুলে চাকরি করতেন! সেজন্য গ্রামের লোকেরা তাঁর বাবা আব্দুর রহিম শেখের উপর বেশি ক্ষীপ্ত ছিলেন। মেয়েকে কেন চাকরি করার অনুমতি দেন, মেয়েদেরকে বিয়ে না দিয়ে কেন স্কুলে পাঠান! এসব কারণে গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িতে খুব কম আসতো।

ড. হালিমা বাগেরহাট জেলায় মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে গান, আবৃত্তি, অভিনয় সবই শেখানো হতো। বিদ্যালয়ের শিক্ষক নগেন বাবু দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন নেতাজি সুভাসচন্দ্রের অনুসারী। তিনি ৯ম শ্রেণিতে পড়াকালীন ঐ শিক্ষকই তাঁকে নেতাজির মন্ত্রে দিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক নেতাজির গল্প বলতেন, বিশেষ করে গান্ধীবাদিরা যে অন্যায় করেছে, মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়ে বলছে, মহাত্মা গান্ধীর জয়, এসব প্রেক্ষাপট বুঝাতে চেষ্টা করতেন। হালিমার শিক্ষকের মতে, নেতাজি সুভাস চন্দ্র দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক সংগ্রাম করছেন। সেই সময় হালিমা প্রচুর বই পত্র পড়তেন। হালিমারও ব্যক্তিগত ধারণা সুভাস চন্দ্র বসু কংগ্রেস নেতৃত্বের চেয়েও আরেক ধাপ উপরে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতা থেকে পালিয়ে পাকিস্তান হয়ে জাপানে চলে যান। জাপানে গিয়ে জাপানিদের সহযোগিতায় ব্রিটিশদের অধীন ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ) হিন্দু -মুসলিম সবাইকে নিয়ে একটা ফৌজ তৈরি করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, মনোমোহিনীর হেডমিসট্রেসও কংগ্রেস করতেন, তিনি কখনো প্রকাশ্যে রাজনীতি প্রচার করেননি। হালিমা বলেন, মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য বিষয় ছিল- বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য ও গণিত। তিনি মনোমোহিনী স্কুলে পড়াশুনায় ভাল ছিলেন, তাঁর ক্লাশে ৬-৭ জন হিন্দু এবং ৬-৭ জন মুসলিম পড়াশুনা করতেন। অন্য ক্লাসে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বেশী। হালিমা বলেন, তাঁর সঙ্গে হিন্দু ছাত্রীদের খুবই গভীর

Dhaka University Institutional Repository
সম্পর্ক ছিল। এখনও যারা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে, বিশেষ করে কলকাতায় যারা আছেন তাঁদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ রয়েছে এবং একধরনের পারিবারিক সম্পর্ক আজও বিদ্যমান।

হালিমার কাছ থেকে জানা যায় যে, তখনকার সময় পর্দাপ্রথা মানে ছিল মুসলমান মেয়েরা বড় হলে ঘরের বাইরে যাবে না। যারা বাইরে যেতেন তারা মাথায় কাপড় দিয়ে চলাফেরা করতেন। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, তাঁর প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, প্রভাদাস গুপ্ত এবং মতি বাবু। মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐ সময় মনোমোহিনী স্কুলে কোন মুসলিম শিক্ষক ছিলেন না, সবাই ছিলেন হিন্দু। হালিমা মনোমোহিনী স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশের পর তার নিজ বাড়ি থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এই কলেজ ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই সময় প্রফুল্ল রায় কলেজে মেয়েদের আবাসনের জন্য কোন হোস্টেল ছিল না। বাড়ি থেকেই পায়ে হেঁটে কলেজে যাতায়াত করতেন। তাঁর বাবা পড়াশুনার খরচ নির্বাহ করতেন । তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন এবং তাঁদের অনেক কলেজ শিক্ষকও কমিউনিষ্ট পাটি করতেন। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, ইন্টারমিডিয়েটে পাঠ্য বিষয় ছিল পৌরনীতি, যুক্তিবিদ্যা, বাংলাও ইংরেজি। বি.এ তে ছিল বাংলা সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য আর দর্শন। তিনি বলেন, কলেজে পড়ার সময় বাম ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী স্যাররা তাঁর সঙ্গে দলগত বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন। নানা ধরনের বইপত্র আর খবরের কাগজের অংশবিশেষ তাঁকে দিতেন, তিনি উৎসাহিত হতেন।

হালিমা বলেন, ঐ সময় কলেজে কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন না। ছেলেদের কলেজে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি পাকিস্তান আমলের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। কলা, মানবিক ও বিজ্ঞান শাখা মিলে কলেজে হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী ছিল। মেয়েরা সচরাচর কলেজে যেত না, তিনি ছিলেন সম্ভবত দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রী। ঐ সময় যাদের (হিন্দু-মেয়েরা) সামর্থ্য ছিল তারা কলকাতায় চলে যেতেন। যারা পারতেন না বিশেষ করে মুসলিম মেয়েরা মেট্রিক পাশ করে ঘরেই বসে থাকতেন। তাঁদের সময় বি,এ ক্লাসে একজনই ছিলেন হিন্দু আর বাকী সবাই মুসলিম। হালিমা খাতুন ১৯৪৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫১ সালে ডিগ্রী পাস করেন।

১.২.৩ আত্মোপলব্ধি

শরৎ বসুদের অখণ্ড ভারত সম্পর্কে তিনি জানতেন ও সমর্থন করতেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বাগেরহাটে ছিলেন। ঐ সময় দেশব্যাপী অনেক দাঙ্গাবিরোধী কর্মকান্ড সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু তিনি এ জাতীয় কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভারত নামে দুটি রাষ্ট্র হল। তখন পাকিস্তানের মানুষ ভাবল তারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হলো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁরা *শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থে, সম্পদে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। হালিমা বলেন যে, পাকিস্তান* রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ শুরু করলো। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যত পণ্য রপ্তানী হবে তার সিংহ ভাগ মুনাফা নেবে পশ্চিম পাকিস্তান। এভাবে দেখা যায় শিক্ষা, চাকরি

Dhaka University Institutional Repository
ও অন্যন্য সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করেছে। শুরু হল পূর্ববাংলার মানুষের ভাষার উপর আক্রমন। যা বাঙালি জাতির মাতৃভাষার আন্দোলনের সূতিকাগার। হালিমা বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত হওয়ার কারণ ছিল রাজনৈতিক সত্তা। তিনি আরো বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা অপরিসীম।

হালিমা মনে করেন, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বা মৌলবাদ এখনও নেই, তখনো ছিল না। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে কখনও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ ছিল না। তবে থাকলেও সেটা ছিল নিজেদের মধ্যে যেমন মুসলমানদের মধ্যে সিয়া-সুন্নীর বিষয়টি বিদ্যমান। আবার হিন্দুদের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপাটা লক্ষ্যণীয় যেমন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাটা স্পষ্টতঃ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত আর এই বিভাগগুলো হলো-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্য ও শুদ্র।

হালিমা বলেন ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষই ছিলনা বরং এটা ছিলো একটি অর্থনৈতিক মুক্তির দাবী। কারণ পাকিস্তান সরকার তখনকার পাট, চামড়া, ধানসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের সিংহভাগ থেকে যে আয় হতো প্রায় সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত, এর সাথে সাথে আবার শুরু হয়েছিল ভয়ানক রকমের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যদিও বাঙ্গালীরা বরাবরই পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার বড় প্রমাণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। সেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী ড. হালিমা খাতুন বর্তমানে নিজ বাড়ি -৭৮/সি ইন্দ্রিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ তে অবস্থান করছেন একজন কালের স্বাক্ষী হয়ে।

১.২.৪ মূল্যায়ন

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকেই বংলার নারীরা রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা রাজপথে, ময়দানে, মিছিল,সমাবেশে অংশ গ্রহন করেন। তৎকালীন সামাজিক অবরোধের কঠোর বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন। হিন্দু নারীদের পাশাপাশি মুসলিম নারীরাও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়, পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের সূচনা হয়। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনা। ১৯৪৮ সাল থেকেই পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধানগণ উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরিকল্পনা করে। পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না, ফলে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। হালিমা খাতুন ১৯৪৮ সালে কলেজ ছাত্রী ছিলেন। তখন থেকেই তিনি এ ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

হালিমা খাতুনের বাবা ছিলেন একজন আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। হালিমার পরিবার ছিল সংস্কৃতিমনা। তাঁদের বাড়ি থেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের হত। তিনি ছোট বেলা থেকেই শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” বইটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে কলেজে যেতেন। কলেজে যাবার পথে অনেক

Dhaka University Institutional Repository
বন্ধুদের বাড়ি ছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে পড়তেন-এটি ছিল এক প্রকার চলমান লাইব্রেরি। গ্রামের মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাবা সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই হালিমা শিক্ষকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়েন তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি করতেন।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন নিয়ে বাগেরহাটের পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল । এ সময় তিনি বিভিন্ন মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। ১৯৫১ সালে বিএ পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার জন্য আসেন। এখানে এসে তিনি কমিউনিষ্ট পাটির সঙ্গে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে, আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রী হিসাবে নিজেকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করান। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। এই ঘটনা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় কর্মী হিসেবে কৌশলে ভাষা আন্দোলন ও দলীয় প্রচার কার্য চালাতেন। তিনি স্কুল কলেজের ছাত্রীদের রাজনৈতিকভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কিভাবে ছাত্রীদের প্রগতিশীল হতে হয় এই শিক্ষা দিতেন। কিভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়, এ সম্পর্কে তিনি ছাত্রীদের অবহিত করতেন। ১৯৫২ সাল ২১ ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছাত্রীরাই বেশী রায় দিয়েছিল। হালিমা ১৯৫৩ সালে গণতান্ত্রিক যুক্তফন্টের সমথর্নে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী বেগম নূরজাহান মুরশিদ এর পক্ষে কাজ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করে নির্বাচনী কর্মকান্ডে অংশ নেন। মুসলিমলীগের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসীম নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে যান। আমেরিকান বায়োগ্রাফিকাল ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত *The International Directory of Distinguised leadership 1997* নামক গ্রন্থে ড. হালিমা খাতুনের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. দৈনিক আজাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১

২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ.৪৫৫।

৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, (বইঘর বিপণী বিতান, চট্টগ্রাম ১৯৮৫) পৃ.২৫৪-২৬১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৬১।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৬১

৬. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গঃ কতিপয় দলিল*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬) পৃ.৩১৩।

৭. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৬৫।

৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

১১. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৫৪-২৬১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪-২৯২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৯৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০৬।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

১৬. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অতীত যুগ*, (ঢাকা : জনসাহিত্য প্রকাশন, ১৯৭২) পৃ. ১০৪।

১৭. ড. হালিমা খাতুন ০৫-০৯-২০১৩, ১০-০৯-২০১৩, ১৪-০৯-২০১৩ এবং ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা করে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধে দু'জন নারীর ভূমিকা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে তরুণদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা ছিল অনেক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় নারীদের নাম তেমন গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। তাঁদের কৃতিত্ব বা অবদানের কথা প্রকাশ করা হয় না কিন্তু দেশপ্রেমিক মহান নারীরা, পুরুষের পাশাপাশি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় পাকিস্তানপন্থী দালাল ব্যতীত, সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১]

স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন অনেক নারী। কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, আশালতা, রওশন আরার মতো অনেক নারী সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পাকিস্তানী হানাদারদের গুলি করে মেরেছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোবরা ক্যাম্পে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেক নারী। ভারতে শরণার্থী শিবিরে ডাক্তার, নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অসংখ্য নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন অনেক নারী শিল্পী। এঁরা ছিলেন যুদ্ধের প্রেরণা। দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, শান্তিকমিটি এবং রাজাকার বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, এদেশের গ্রাম-গঞ্জে ও শহরে অসংখ্য নারী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, অস্ত্র বহন এবং লুকিয়ে রেখেছেন, গোপন সংবাদ আনা-নেওয়া করেছেন। এমন অনেক অজানা নারী আছেন যারা নিজের সব স্বার্থ ত্যাগ করে কখনো নিজের সন্তানকে, কখনো স্বামীকে দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অথচ এই নারীরা তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি যথাযথভাবে পাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেছেন অনেক নারী। কিছু সংখ্যাক নারী এক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ হয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ফলে যে অর্জন বাঙালির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে তা কোন অংশে কম নয়।[২] এক্ষেত্রে নুরজাহান মুরশিদ, ডা. মাকদুম নার্গিস রত্না, আমেনা আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, বেবী মওদুদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে যে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাওয়াতে কম বেশী আক্রান্ত হওয়ার আশংকা ছিল। আর নারীর ক্ষেত্রে ছিল শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা। এ সব ঝুঁকিকে সঙ্গে নিয়েও দেশের মুক্তির জন্য পুরুষদের পাশাপাশি অসংখ্য নারী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। দিক-নির্দেশনা ছাড়াই সশস্ত্র যুদ্ধসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সকল গৌরবের তাঁরাও সমান অংশিদার।[৩] অথচ তাঁদের সেই গৌরবময় ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে আজও পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে উঠে আসেনি। এ পটভূমি সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ২ জন নারীর ভূমিকা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মমতাজ বেগম ও কাঁকন বিবি। এঁদের মধ্যে মমতাজ বেগম ছিলেন নেত্রী স্থানীয়। অন্যজন কাঁকন বিবি ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়া এক সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা। এই অধ্যায়ে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা নারীর জীবন ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ কাঁকন বিবি

খাসিয়া সম্প্রদায়ের নারী- কাঁকন বিবি। তিনি ৭১ এ বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়া নারীদের মধ্যে অন্যতম একজন। সমগ্র দেশের নর-নারীরা ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে । এ যুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র ছিল না, ছিল না কোন যোগ্য প্রশিক্ষণ। তবু প্রাণ রক্ষার তাগিদে ও দেশ রক্ষার স্বার্থে যে যেভাবে পেরেছে, যুদ্ধ করেছে। কাঁকন বিবি ছিলেন তেমনি একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। বিশটির মত যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান এখনো সহযোদ্ধাদের মুখে শোনা যায়। কাঁকন বিবির স্বামীর নাম আব্দুল মজিদ খাঁন, গোবরা ক্যাম্পের সীমান্ত রক্ষী ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আব্দুল মজিদ খাঁন সিলেটের আকলিয়া ক্যাম্পে চলে যান তখন কাঁকন বিবি একা হয়ে পড়েন। গোবরা ক্যাম্পের অবস্থান সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজারে। কাঁকন বিবি স্বামীকে খুঁজতে বের হলে, পাকিস্তানীদের কাছে দোয়ারা বাজারের উত্তরের একটি ক্যাম্পে ধরা পড়েন । পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে টেংরা ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং মুক্তিবাহিনীর লোক হিসাবে সন্দেহ করে তাঁর উপর অনেক অত্যাচার করে। অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কাঁকন বিবি ভেবেছিলেন তিনি আর বেঁচে থাকতে পারবেন না। লোহার সিক গরম করে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, এখনো রয়ে গিয়েছে সেই অসহনীয় যন্ত্রণা। ক্যাম্পের মেজর বলেন, তুমি সত্যি পরিচয় বললে বেঁচে যাবে। কাঁকন বিবি জানান, তাঁর স্বামী পাজ্ঞাবী সৈন্য কিন্তু স্বামীর তৎকালীন অবস্থান বলতে পারেননি। তিনি আরো বলেন, আর্মিরা তাঁর স্বামীর খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে তিনি আখলিয়া ক্যাম্পে আছেন। পাকিস্তানী আর্মির কাছ থেকে কাঁকন বিবি তাঁর স্বামীর খোঁজ-খবর জানতে পারেন।[৪]

কাঁকন বিবির স্বামী পাকিস্তানীদের হয়ে কাজ করছে, এজন্য কাঁকন বিবিকে পাকিস্তানী সৈনরা ছেড়ে দেয় এবং একটি কার্ড করেও দেয়। এতে করে কাঁকন বিবির পাকিস্তানী ক্যাম্পগুলোতে যাতায়াত করতে সুবিধা হয়। সে সময় কাঁকন বিবির এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর অবস্থান জানার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার। তখন ঐ এলাকায় আসেন সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলী। তিনি কাঁকন বিবির ঘটনাটি শোনেন এবং তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসেন। সোর্স হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আলাপ করেন তাঁর সাথে। এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁকন বিবির যোগাযোগ হয়। কাঁকন বিবি ৫নং সেক্টরের লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পের হয়ে কাজ করেন। প্রথমে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার কাজ পান, পরবর্তিতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানীরা সুনামগঞ্জে প্রবেশ করেছিল আগষ্ট মাসে। আগে থেকে চলছিল পাকিস্তানীদের প্রতিরোধের প্রস্তুতি। তাঁদের পথ রোধ করতেই গভীর রাতে ব্রীজ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় মুক্তিযোদ্ধারা, এই দায়িত্ব পড়ে কাঁকন বিবির উপর। কাঁকন বিবি এই অপারেশনকে সফল করার জন্য কলাগাছের ভেলায় করে বোমা বারুদ, অস্ত্র ও অন্যন্য রসদ নিয়ে যান। একাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জড়িয়া সেতুর কাছে পৌছান। তাঁর বিশেষ সংকেত পেয়ে অন্য পথে আরো একজন মুক্তিযোদ্ধা পৌছে যায় ব্রিজের কাছে। মাইন বিস্ফোরণে ব্রীজ ধ্বংসে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কাঁকন বিবির। সেই এলাকায় প্রায় সবগুলো গেরিলা অপারেশনে তিনি সক্রিয় এবং গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গেরিলা অপারেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মহবতপুর, কান্দাগাঁয়ের যুদ্ধ, বসরাই, টেংরা টিলার যুদ্ধ, সিলাইর পাড়ের যুদ্ধ সহ বিশটির মত যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। পনেরোটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি অস্ত্রসহ গোলাবারুদ বয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে গিয়েছেন। পাকিস্তানীদের গোলাবারুদ গোপনে বের করে এনে কলা গাছের ভেলা চালিয়ে মুক্তি বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতেন। খালবিল, নদীনালা, ঝোঁপঝাড়-সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন দেশ শত্রুমুক্ত করার জন্য।

সুনামগঞ্জে যেদিন যুদ্ধ হয়, সেদিনের ভয়াবহ যুদ্ধে কাঁকন বিবি সারাক্ষণই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। পাক বাহিনীর ক্যাম্প ছিল 'যয়ার দক্ষিণ দিয়া'। সেই ক্যাম্পের অবস্থান জেনে কাঁকন বিবি চলে আসেন মুক্তিবাহিনীর কাছে। বিভিন্ন ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি একত্রিত করেন। তাঁরপর সবাইকে নিয়ে ছুটে চলেন, পথে পড়ে একটি শীর্ণ নদী। কলা গাছ কেটে ভেলা বানিয়ে, দু'জন তিনজন করে পার হন মুক্তিযোদ্ধারা, দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রু ক্যাম্প দখল করার জন্য দু'দিক থেকেই আক্রমন করেন। একটি গ্রুপ ছুটে যায় ব্রিজের কাছাকাছি, যে ব্রীজ সিলেটের সঙ্গে সুনামগঞ্জকে সংযুক্ত করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা সময়মতই বোমা মেরে গুড়িয়ে দেন সেই ব্রীজ, শুরু হয় দুইদিক থেকেই মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ। এই খবর ছড়িয়ে পড়ে মুহুর্তের মধ্যে। খবর পেয়েই সিলেট থেকে পাক বাহিনী ছুটে আসে, ভাঙ্গা ব্রীজ দেখে তারা ফিরে যায়। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর দুই রাত ও একদিন সামনা-সামনি যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়, পাকবাহিনীরা মুক্তি বাহিনীর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। জয়বাংলা শ্লোগান দিয়ে ওঠেন মুক্তিবাহিনী। কাঁকন বিবি এই দিনের ঘটনাটি জানালেন এইভাবে, 'আমরা এক পর্যায়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে থাকি এবং ওদেরকে ঘিরে ফেলি। এক সৈন্য হঠাৎ করে আমাকে দেখে চিনে ফেলে এবং বলে ওঠে! এতো সেই মহিলা! আগেই আমার মনে হয়েছিল এই মহিলা মুক্তিবাহিনীর লোক'।

মুক্তিযোদ্ধারা সিলেটের বার কাফন ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়ার সময় কাঁকন বিবি উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন খাবার খেতে ব্যস্ত, সে সময়টি তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছিলেন। এই ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া যুদ্ধ কৌশলের একটি অন্যতম দিক ছিল। নভেম্বর মাসের দিকে তিনি গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন, নির্মম অত্যাচার হয় তাঁর উপর। এখনো শরীরে সেইসব নির্যাতনের দাগ আছে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১ জন্ম ও বেড়ে ওঠা

কাঁকন বিবির জীবন ইতিহাস বেশ করুণ। মাতৃসূত্রীয় খাসিয়া পরিবারে জন্ম কাঁকন বিবির পারিবারিক নাম- কাকাত হেঞ্চেইতা, ডাক নাম কাঁকেউ। তিনি ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জের সিমান্তের কাছে 'নওএই' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নেহা এবং মায়ের নাম দামেলি নিয়তা। তাঁরা জুম চাষ করে জিবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা তিন ভাই ও দুই বোন। সবার বড় বোন কাপল, এরপর দুই ভাই উহোর ও ভাবনাই। ভাই বোনদের মধ্যে সবার ছোট এই কাঁকেউ। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়নি। জন্মের পূর্বেই বাবাকে হারান। তাঁর যখন দেড় বছর বয়স, তখন হারান মাকে, নানীর কাছে তিনি বড় হন। শৈশব থেকেই তিনি পিতা মাতার আদর থেকে বঞ্চিত। পরিবারের সকলের ছোট বলে, ভাই বোনদের আদর তাঁর ভাগেই বেশি ছিল। কাঁকন বিবির বড় বোন কাপল নিয়তা আনসার বাহিনীতে কর্মরত এক মুসলমান কমান্ডারকে বিয়ে করেন। বড় বোনের সঙ্গে কাতল বাড়ী থাকেন কাঁকন বিবি। বড়বোনের উদ্যোগে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হন, তাঁর নতুন নাম হয় নূরজাহান, চলে আসেন সুনামগঞ্জে। সুনামগঞ্জে তাঁর পরিচয় হয় বাংলা বাজারের শহীদউদ্দিনের সাথে এবং বিয়ে হয় তার সাথেই। পরপর ৫টি সন্তান জন্ম নিয়ে মারা যায়; পরবর্তীতে তিনি যখন অন্ত:সত্ত্বা, তখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে মনমালিন্য হয় এবং তালাক হয়ে যায়। এরপর বড়বোনের স্বামীর উদ্যোগে 'বোগলা ক্যাম্পে'র সীমান্তরক্ষী আব্দুল মজিদ খাঁনকে কাঁকন বিবি বিয়ে করেন। কাঁকন বিবি ছিলেন মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত। কোন মতে চলছিল কাঁকন বিবির সংসার । তাঁর একটি মাত্র কন্যা সন্তান, নাম- সখিনা বেগম।

২.১.২ একাত্তর পরবর্তী জীবনযাপন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার মানচিত্রটি বিশ্বে স্বীকৃতি পায়। মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবিরা পান না কোন স্বীকৃতি। যে ভিক্ষুক ছদ্মবেশ নিয়ে দিনের পরে দিন দেশের জন্যে সংগ্রাম করেছেন সেই ভিক্ষাবৃত্তিই হয় তাঁর জীবন চলার পাথেয়। স্বাধীনতার পরে তাঁর নিরুদ্দেশ স্বামী আর ফিরে আসেনি। কাঁকন বিবি যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন তাঁর নিজের বাড়িতে। কাঁকন বিবির বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের জিরাগাঁও গ্রামে, বাঙালি সমাজে তাঁর ঠাঁই হয় না। যে মেয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্যাতিত হয়েছে তাঁকে কে দেবে আশ্রয়? তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কাঁকন বিবি দোয়ারা বাজার উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের জিরাগাঁও গ্রামে আব্দুল করিম এর কুঁড়েঘরের বারান্দায় মেয়ে সখিনাসহ আশ্রয় নেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে সখিনা বেগমকে নিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর স্বাধীনতা পরবর্তী সংগ্রামী জীবন। এ বাড়ি ও বাড়ি ভিক্ষে করে নিজের ও মেয়ের জীবনকে বাঁচান। অসহায় অবস্থায় ১৯৭৯ সালের দিকে একই ইউনিয়নের জহুর আলী কে বিয়ে করেন কাঁকন বিবি। বাজারে দু'জনে শুটকি মাছের ব্যবসা করে ভালই দিন কাটাচ্ছিলেন কিন্তু সাত আট বছর ঘর করার পর আবারও ঘর ভেঙ্গে যায় তার। বাঁচার তাগিদে লক্ষ্মীপুরে একাই শুটকির ব্যবসা চালিয়ে যান, এখানেও ব্যর্থতা। তবে

Dhaka University Institutional Repository
অঞ্চলের সবাই তাঁকে "খাসিয়া মুক্তিবেটি" বলে চেনে, এলাকায় যুবক বৃদ্ধ সবাই তাঁকে 'মা' বলে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন; অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই বৃদ্ধা বয়সেও ভিক্ষা করতে হতো তাঁকে।

২.১.৩ ছিয়ানব্বই পরবর্তী জীবনযাপন

খাসিয়া আদিবাসী 'কাকাত হেইঞ্চিতা' ওরফে কাঁকন বিবি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ৭১-এর স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। ১৯৯৬ সালে সংবাদপত্রে তাঁর দুর্বিষহ ও সংগ্রামী জীবনের সংবাদ প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হয়। কাঁকন বিবির দুরবস্থা সংবাদপত্রে আসার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাঁকন বিবিকে ০.৭২ একর খাস ভূমি প্রদান করেন এবং তাঁকে বীর প্রতীক উপাধি দেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বীরপ্রতীক উপাধির কোন সনদপত্র তিনি পাননি। তার কারণে, বীরপ্রতীক উপাধির সম্মান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাথেকে তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন। সিলেটের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান কাঁকন বিবিকে ঐ জায়গায় একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীতে দৈনিক জনকণ্ঠ কাঁকন বিবিকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়। কয়েক বছর ভালই কেটেছিল তাঁর, হঠাৎ করে ২০০৭ সালের প্রথম দিকে জনকণ্ঠ কাঁকন বিবির এই ভাতা বন্ধ করে দেয়,[৬] আবার শুরু হয় দুর্বিষহ জীবন।

যুগে যুগে নারীরা দেশের স্বার্থে সংগ্রাম করেছেন। বিভিন্ন আন্দোলনে পুরুষদের সাথে অংশ নিয়েছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম-নীতি ও উদ্যোক্তার অভাবে ইতিহাসে এঁদের নাম যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি। খাসিয়া মুক্তিবেটি কাঁকন বিবিও হারিয়ে যেতেন কালের পাতা থেকে। সুনামগঞ্জের দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠে' কাঁকন বিবিকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখা হয়েছিল। প্রগতি সংঘ ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সংগ্রামী নারী বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা মহিলা ক্যাম্প গোবরার মুক্তিযোদ্ধা নারীদের একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১২ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে একাত্তর পর্যন্ত সংগ্রামী নারীদের পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়। ইতিহাস উপেক্ষিত এই বীর নারীর ইতিহাস সেদিনই আত্মপ্রকাশ করে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সনে নারী প্রগতি সংঘ মুক্তিযুদ্ধে বীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁরাই প্রথম এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করেন। দেশের অনেকেই আজ তাঁকে চিনতে পেরেছে। কাঁকন বিবি জনকণ্ঠ গুণিজন ও প্রতিভা সম্মান '৯৮ পুরস্কার পান। পুরস্কারের জন্য যখন কাঁকন বিবির নাম ঘোষণা করা হয় তখন অতিথিরা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে সম্মান জানায় এবং প্রতিভা পুরস্কার ২৫০০০.০০ টাকা পান।[৭] ২০০৯ সালে কাঁকন বিবিকে জনতা ব্যাংক ১৫ লাখ টাকার অনুদান দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে জনতা ব্যাংকের অনুদানের চেক কাঁকন বিবির হাতে তুলে দেয়।[৮] অনুদানের অর্থ জনতা ব্যাংক এফডিআর করে দেয়ার পাশাপাশি চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ী নির্মাণ করে দিয়েছে। এই

Dhaka University Institutional Repository
সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ২০১০ সালে জাতীয় দৈনিক কালেরকণ্ঠ সম্মাননা দেয়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ কাঁকন বিবি জানান, রোগে শোকে এখন তিনি কাতর, টাকার অভাবে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

২.১.৪ আত্মোপলব্ধি

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যাঁরা এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁরাই সেই গৌরবের অংশীদার। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছে তাঁরা সময়ের পরীক্ষিত সন্তান। রাজাকার, আলবদর, আল-শামস্ এরা স্বাধীনতা বিরোধী ও দেশের শত্রু। এই শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কাঁকন বিবি নতুন প্রজন্মকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি রাজাকারদের ফাঁসি চাই। এবার তাঁদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা বেঁচে গেলেও এই যুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত করতে হবে।

কাঁকন বিবি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সেনাদের খবরাখবর পৌঁছে দিতাম। ঐ সময় রাজাকার আলবদরদের ঘৃণ্য তৎপরতা ও নির্যাতন দেখেছি ও সয়েছি। রাজাকার আলবদররা পাকিস্তানী সেনাদেরকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং মানুষ হত্যা করেছে। মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি করেছে। সেই অপমান, গণহত্যা এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে। রাজাকারদের বিচার এখন সময়ের দাবি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

২.১.৫ মূল্যায়ন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ১৯৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশ গ্রহণ করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনামগঞ্জের নুরজাহান বেগম ওরফে কাঁকন বিবি। ছোটবেলা থেকে দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার আলো থেকে তিনি বঞ্চিত। মুক্তি সংগ্রামে কাঁকন বিবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। সংগ্রামী এই নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য একটিবারও অত্যাচার ও দুঃশাসনের কাছে মাথা নত করেননি। জীবনের উপর বারবার ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। তাঁর সংগ্রাম ও যুদ্ধের চরম সার্থকতা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ শত্রু সেনাদের আত্মসমর্পণ। এদেশের নারী সমাজ ও প্রচার মাধ্যমগুলো কাঁকন বিবিকে বিভিন্নভাবে সন্মানিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাঁকন বিবিকে বীর প্রতীক ঘোষণা করেছেন। সরকার জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবিকে ২০১০ সালে ১৫ লক্ষ টাকার এফডিআর করে দেওয়ার পাশাপাশি পাকাবাড়ীও নির্মাণ করে দিয়েছেন। ২০০৬ সালে ভারতের সেনাবাহিনী কাঁকন বিবিকে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করেন। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের জিরাগাঁও গ্রামে খাইবার নদীর পাশে কাঁকন বিবি তাঁর নিজ বাড়িতে একজন কালের স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. *The Saturday Review*, USA, 22 May , 1971.

২. কবীর মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, (ঢাকা: ইনস্টিটউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভলপমেন্ট, ২০০৬), পৃ.৮৩।

৩. মফিদুল হক , *নারীমুক্তির পথিকৃত*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ.৫৫ ।

৪. জোবায়েদা নাসরিন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী*, (ঢাকা: শব্দশৈলী ২০০৭) পৃ. ২১,২২।

৫. জোবায়েদা নাসরিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৬. দৈনিক সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ: ১।

৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ: ১২।

৮. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ: ১।

৯. কাঁকন বিবি ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি অসুস্থ থাকার কারণে তার পৃষ্টপোষক এ্যাডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধুরী খসরুর সাথে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তিনি সুনামগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের আহ্বায়ক। তিনি ০৭-০৮-২০১৩,১১-০৮-২০১৪ এবং ১৫-০৮-২০১৩ সন্ধা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা করে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ মমতাজ বেগম

১৯৭১ সাল, মুক্তি যুদ্ধে যে নারীরা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় একজন মমতাজ বেগম। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছে থেকে রাজনীতি করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জল। মমতাজ বেগম ১৯৭১ সালে নারীদের পুর্নবাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম.এন.এ) হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য মননীত হয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, নারী প্রগতি সংঘ, নৌ কমান্ডো এসোসিয়েসান এবং নারী কণ্ঠ থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশই মমতাজ বেগমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার কসবাতে ছাত্ররা মিছিল করে। মমতাজের চাচাত ভাই আবদুর রউফের (বর্তমান শ্রমিক নেতা) নেতৃত্বে ছাত্রদের মিছিল বের হয়। ছাত্ররা রেলযোগাযোগে বাধা দেওয়ার জন্য রেললাইনের উপর শুয়ে পড়ে। ছাত্রদের সাথে মমতাজও একই অবস্থান নেন। তিনি ছাত্রদের কালো ব্যাজ পরিয়ে দেন।[১] ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিল আন্দোলনে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন। তৎকালীন কুমিল্লা মহিলা কলেজের ছাত্রী সংসদের (১৯৬৫-৬৬) প্রথম সহসভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি কুমিল্লা জেলার ছাত্রলীগের সহসভাপতি হিসেবে ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মহিলা ও ছাত্রীদের মাঝে ছয় দফার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি আমেনা বেগমের নেতৃত্বে সভা এবং মিছিলে অংশ নেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। এগারো দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালে এগারো দফা আন্দোলন চলাকালীন একদিন পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। তখন শেখ হাসিনা, তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুর রউফ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহ আহত অনেককেই মমতাজ বেগম ছাত্রীদের কমনরুমে প্রাথমিক পরিচর্যা করেন।[২] তিনি ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণেও উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর বাড়ি, মরিচা হাউজে মহিলাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক পরিচর্যা প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার পালিয়ে আসেন। তিনি একটি বাহিনী গঠন করতে চেয়েছিলেন। মমতাজ বেগম ২৬ মার্চের পরে কসবায় নিজ বাড়িতে ভাই, বাবা, ছাত্রলীগের সদস্য, সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও ছুটিতে আসা সেনা সদস্যদের নিয়ে মেজর বাহারকে বাহিনী গঠনে সহযোগিতা করেন। মমতাজ বেগম বলেন, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সাল প্রবাসী মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়। ঐ সময় মমতাজ বেগম ভারতের আগরতলা সার্কিট হাউজে

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে আগরতলায় মহিলা মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে নারীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করণসহ তাদের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য রেখেছেন এবং সমস্যা সমাধান করেছেন। যুদ্ধাহতদের সেবাদান করেছেন, শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। এসব কার্যক্রমে মমতাজ বেগম, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, ফরিদা খানম সাকী, শামসুন্নাহার ইকোসহ প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।[৩]

স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।[৪] রোকেয়া হল থেকে তিনি এ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। মিছিলে শ্লোগান ছিল- 'বাংলার মানুষ অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। পিন্ডি ৰা ঢাকা? ঢাকা, ঢাকা, স্বাধীন কর, স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি। ছাত্রজনতার বিশাল সভায় শ্লোগানে লক্ষ জনতার গগন বিদারী আওয়াজ। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট মিছিল আসছিল। জগন্নাথ কলেজের মিছিলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম কিরণ, মঞ্চের দিকে প্রবেশ করেন। ডাকসুর তৎকালীন ভিপি আ স ম আব্দুর রব সেই পতাকাটি নিয়ে কলাভবনের ছাদে ওঠেন। পাকিস্তানের পতাকাটি আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাটি উত্তোলন করেন। অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তিনিও শ্লোগান দেন।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভা হয়। মঞ্চের সামনে দেশের কয়েক হাজার নারী শ্রমিক, গৃহিনী, কৃষাণী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই জনসভায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মমতাজ বেগমও দায়িত্ব পালন করেন।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।[৫] এই ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। জনগণ যে যার মত প্রস্তুতি নিল। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারা ২৩ মার্চ পাকিস্তান ডে (Pakistan day) এর বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] সেখানে মমতাজ বেগম আমর্স প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন। শামসুন্নার ইকো পতাকা বহন করেছিলেন। প্যারেডে সালাম দেন মমতাজ, ফরিদা খানম সাকী, রাশেদা খানম, শেফালী সাহা সহ আরো অনেক নারী। আর্মস প্যারেডের পূর্বক্ষণে আনুষ্ঠানিক ভাবে বড় পতাকাটি উত্তোলন করেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আলম খান খসরু। সালাম গ্রহণ করেন, স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চারনেতা- নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন। পল্টনকে ঘিরে হাজার হাজার ছাত্রজনতা প্যারেড উপভোগ করেন এবং করতালি, শ্লোগান, পতাকা উত্তোলন এর মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে আর্মস প্যারেডকে উৎসাহিত করেন। মমতাজ বেগম গর্বের সাথে বলেন, আমরাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আর্মি বাহিনী, পল্টনে প্যারেডের কুচকাওয়াজ শেষে

Dhaka University Institutional Repository
অন্যান্যদের সাথে প্যারেড নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বাড়ির দিকে যাই। প্রেসক্লাব, শাহবাগ মোড়, সাইন্স ল্যাবরেটরি, কলাবাগান পেরিয়ে হাজার হাজার জনতা ৩২ নম্বর বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে প্যারেডের পতাকা হস্তান্তর করেছিলেন। আ.স.ম আব্দুর রব সহ চার নেতা ৩২ নং বাড়ির গাড়ি বারান্দায় বঙ্গবন্ধু গার্ডের সালাম নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়েছিলেন আ স ম আব্দুর রবসহ নেতারা। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গার্ডবাহিনী ও লাখ জনতার প্রচন্ড ভিড় ছিল। স্মৃতিচারণে মমতাজ বেগম বলেন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই অভ্যুত্থানে কৃষক, শ্রমিক এবং ছাত্র জনতা নারী পুরুষ কেউ কারো থেকে পিছিয়ে ছিলো না। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নারীরা স্বাধীনতার পক্ষে জেগে উঠেছিলেন। শহর, পাড়া, মহল্লা, গ্রামগঞ্জ সব জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে যায়। তখন মা, বোনেরা অর্থ এবং গহনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে গেরিলা কর্মকান্ডে মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হতো। নারীরা তাঁদের খাবার যোগানো, তথ্য দেয়া, আহতদের সেবা ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এ দেশের সাধারণ নারীরা অবদান রেখেছেন।

গেরিলা স্কোয়ার্ডে দায়িত্ব পালনকারী অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা হলেন, মমতাজ বেগম। বাংলাদেশে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। মমতাজ বেগম তাঁদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে, পূর্বাঞ্চলীয় বি এল এফ (মুজিব বাহিনী বা Bangladesh Liberation Force) এ তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বি এল এফ পূর্বাঞ্চলীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কর্ণেল এম এ রব চীফ অব স্টাফের সহযোগিতায় আগরতলায় বিএসএফ (Border Security Force) এর হেড কোয়ার্টারে অস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধ পরিচালনা প্রশিক্ষণ হয়। শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে আগরতলায় তিনি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বি এল এফ এর পক্ষ থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান প্রদান করার দায়িত্ব পালন করেন। আগরতলার বিশালগড়ে বিএলএফ-এর ভাড়া বাড়িতে শেখ ফজলুল হক মনি ও মমতাজ বেগম বাবা মাসহ থাকতেন। গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় সভা ও যোগাযোগ সব এ বাড়ি থেকেই হত। জেনারেল এমএজি ওসমানি, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশারফ ও কর্ণেল (অব) শওকত আলী প্রমুখ সেনা কর্মকর্তারা ঐ বাড়িতেই যোগাযোগ রাখতেন। বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খবরাখবর এখানেই পাঠানো হত। বিএলএফ এর প্রয়োজনীয় সব অর্থ মমতাজ বেগমের কাছেই রক্ষিত থাকতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ক্যাপ্টেন গফফার ও মেজর খালেদ মোশাররফের বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। কসবা এলাকায় শরণার্থীদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে থাকেননি তাঁদের রেশনের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে উদ্বুদ্ধকরণের কাজে মমতাজ বেগম অংশ গ্রহণ করেন। দেশের অভ্যন্তরে নির্যাতিত মহিলাদের সহযোগিতার জন্য এখানে খবর পাঠানো হতো। ত্রিপুরার প্রথিতযশা প্রয়াত সাংবাদিক, অনিল ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতি গৌরি ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় তাদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী পুর্নবাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত এ কাজ চলতে থাকে। সারদা সেবা সংঘের সহযোগী সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository
হিসাবে 'মহিলা সংঘ নামে' একটি সেবা সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমে শরণার্থী ক্যাম্পে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও সেবা কাজে তিনি অংশ-গ্রহণ করেন। মহিলা সংঘের সভাপতি ডাঃ নরুন্নাহার জহুর, সম্পদক বেগম ফরিদা আক্তার এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে মমতাজ বেগম কাজ করেন।[৭] মমতাজ বেগম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল যখন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়, তখন মুজিব নগরে মহিলা সদস্যদের মধ্যে একমাত্র মমতাজ বেগম উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা তখনো পৌছাননি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের জন্য সম্ভাব্য সহায়তা দিয়েছেন । তাছাড়া তিনি নারীদেরও মুক্তিযুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৮]

২.২.১ পারিবারিক জীবন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখা সাহসী নারী- মমতাজ বেগম, ১৯৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল, ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার সিমরাইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুল গণি ভূঁঞা ও মাতার নাম জাহানারা খানম। মমতাজ বেগমের নানার বাড়ি ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার মুরাদনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে। নানার নাম আবদুল মজিদ, নানীর নাম নুরজাহান খান। নানা স্থানীয় মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। নানী লেখাপড়া জানতেন। মমতাজ বেগমের তিন খালা ও এক মামা। মামা এনট্রান্স পাশ করে বৃটিশ কোম্পানীতে চাকরি করতেন। মা খালারা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। মা ৫ম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে কেউ জড়িত ছিলেন না, তবে তাঁর মায়ের নানা ব্রিটিশ আমলে ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

মমতাজ বেগমের দাদার নাম হাজী ফরাসৎ আলী, ত্রিপুরা স্টেটে কাজ করতেন। তাঁর দু'টি তালুক ছিল। চাচারা সকলে তালুক দেখাশুনা করতেন। তাঁর বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন। মমতাজ বেগমের দুই চাচা ও এক ফুপু। মেজো চাচার নাম এ, কে, এম ফজলুর রহমান জিনু, তিনি ছিলেন ফটোগ্রাফার। ছোট চাচা হলেন এ, কে এম আজিজুর রহমান, তিনি ছিলেন এডভোকেট। মেজ চাচার ছেলে আবদুর রউফ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। বাবা কসবা থানার মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। পরবর্তিতে তিনি ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর বাবাকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী করা হয়। বাবা যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামীলীগ রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত হন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে মমতাজের বিয়ে হয়। স্বামী এ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান। বর্তমানে তিনি International War Criminal Prosecution এর একজন আইনজীবী।

২.২.২ শিক্ষা ও কর্মজীবন

মমতাজ বেগম বাড়িতেই মায়ের কাছে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি কসবা হাইস্কুলের প্রাথমিক শাখায় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি অধ্যয়ন করেন। কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা হাইস্কুলে ৬ষ্ট থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ঢাকায় কামরুন্নেসা স্কুল থেকে ১৯৬১ সালে এস, এস, সি পাশ করেন। ইডেন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository
কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বাতিল করার আন্দোলনে যুক্ত হন বিধায় ইডেন কলেজ থেকে এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরবর্তিতে তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে এইচ, এস, সি ও ১৯৬৭ সালে বি,এ পাশ করেন। বি,এ পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৬৭-৬৮ সালে রোকেয়া হলে নবগঠিত ছাত্রলীগ শাখার সভানেত্রী হন। তিনি ১৯৬৮-৬৯ সালের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। মমতাজ বেগম ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগ থেকে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে রায়ের বাজার গার্লস স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৯৭০ সালে কায়েদে আজম কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। মমতাজ বেগম ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম.এন.এ) হন। ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কায়েদে আজম কলেজে প্রভাষক হিসাবে থাকাকালীন মমতাজ বেগম ১৯৭৮ সালে এল.এল.বি ডিগ্রি অর্জন, ১৯৭৯ সালে এ্যাডভোকেট হিসাবে এনরোলডমেন্ট এবং ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে বার কাউন্সিল তাঁর এ্যাডভোকেটের সনদ স্থগিত করে দেয়। পরে তিনি ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে বারকাউন্সিল তাঁর এ্যাডভোকেটের সনদ স্থাগিতাদেশ তুলে এবং পুনরায় তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন।

মমতাজ বেগম গত ১২ মার্চ ২০০৯ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছে থেকে রাজনীতি করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ছিলো তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান (অবৈতনিক)-এর দায়িত্ব আজও পালন করে যাচ্ছেন।

২.২.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী জীবনযাপন

১৯৭২ সালে গণপরিষদের সদস্য (এম.সি.এ) হিসেবে, মমতাজ বেগম বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় সহযোগিতা ও স্বাক্ষর প্রদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ এর সংবিধানের ২৭, ২৮ ধারায় নারীর সমতা বিষয়ক নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য বিচারপতি কে, এম সোবহানের নেতৃত্বে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। মমতাজ বেগম নারী পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় গিয়ে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সহযোগিতা করেন। তিনি কসবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কসবা নারী পুনর্বাসন বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সদস্য হন। আত্মীকৃত কলেজগুলোতে কোন পদ সৃষ্টি না হওয়ায় মমতাজ বেগম অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পদ সৃষ্টির উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে সহ-সভানেত্রী হিসাবে নারী ও সমাজের

Dhaka University Institutional Repository
অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামে নিয়োজিত আছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিরক্ষা, মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদের সদস্য, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি বাংলাদেশ, রেডক্রস সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর আজীবন সদস্য। স্বাধীনতা পরবর্তী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেকে জড়িত রেখেও মমতাজ বেগম দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭২ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিনি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহাম্মদ-এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন এর আঞ্চলিক কনফারেন্সে (সিডনি, অস্ট্রেলিয়া) যোগদান করেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী, সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির রজত জয়ন্তি অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি জাতিসংঘের ৫২তম Annual DPI/NGO কনফারেন্স নিউইয়র্কে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ৩১ তম I.A.W Iniennial Congress New York যোগদান করেন। ২০০১ সালে 23rd Triennial Conference A.C.W. W Hamilton Ontario, Canada তে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া কর্মসূত্রে ও পেশাগত কারণে তিনি সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইরাক, সৌদিআরব, ইংল্যান্ড, প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করেন। মমতাজ বেগম বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনে, ১৯৬৯- এর গণ আন্দোলন, ১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সর্বত্রই তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বর্তমান দেশ গঠন, নারী উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা লক্ষণীয়। শুধুমাত্র ১৯৭১- এর মার্চ মাস এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের কথা বর্ণনা করলে, নারীর অবদানের কথা শেষ হবে না।

২.২.৪ আত্মোপলব্ধি

স্মৃতিচারণের শেষ পর্যায়ে মমতাজ বেগম বলেন, মানবতা, শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই ভূখণ্ডের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সে স্বপ্ন আজও অর্জিত হয়নি। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যতগুলো ক্যাম্প ছিল অধিকাংশ ক্যাম্পে গিয়েছি, ছেলেমেয়ে উভয়কেই যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি। যেখানে যোদ্ধারা আহত এবং অসুস্থ হয়েছেন সেখানেই ছুটে গিয়েছি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। মমতাজ বেগম আরো বলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অনেক কাজ করেছি কিন্তু কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে যে সকল নারীরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সঠিক তথ্য আজও অজানা। দেশবাসী মা-বোনদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা জানতে পারছে না। নব প্রজন্ম মা-বোন, দাদী-নানীদের বীরত্ব নিয়ে গর্ববোধ করতে পারছে না। মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারী পাকসেনা, রাজাকার আলবদরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। জাতি তাদের 'বীরঙ্গনা' খেতাব দিয়েছে। এই খেতাব দিয়ে বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অবমাননা করেছে। বীরাঙ্গনা না বলে 'মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী' হিসেবে তাদের জীবন মান রক্ষার ব্যবস্থা করলে অনেক ভাল হত-এ দিকটা ভেবে দেখা দরকার। আরো

Dhaka University Institutional Repository
লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এক শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধ না করে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে ইতিহাস বিকৃত করছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি কঠোর হস্তে রোধ করতে হবে। তিনি বলেন, বগুড়ার শেরপুরের বিধবা পল্লীর মেয়েদের কিভাবে সম্মানিত করা যায় তার একটি পরিকল্পনা আমার রয়েছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। এ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা যায়নি। আমার প্রত্যাশা হল, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাক। মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নিয়েছিল বলেই, মুক্তিযুদ্ধের এই বিশাল জয় সম্ভব হয়েছে। এই নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও মুক্তি আজও অনিশ্চিত। তবু আমরা আশাবাদী, মুক্তিযুদ্ধের মত দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নারী- পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আবারও ফিরিয়ে আনতে পারবো। জাতি এগিয়ে যাবে আলোর পথে। নতুন প্রজন্মের নারীদের কাছে মমতাজ বেগমের কাম্য, তাঁরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে কাজ করে যাবেন তবেই সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন সম্ভব।

২.২.৫ মূল্যায়ন

মমতাজ বেগমের পরিবার ছিল প্রগতিশীল। তিনি পারিবারিক পরিমন্ডলে সমাজ সেবায় একজন সচেতন ব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠেন। বাবা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখে রাজনীতিতে উৎসাহিত হয়েছেন। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থাকে তিনি কোনভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।

জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই মমতাজ বেগম জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেন। তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী নেত্রী, জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলন ও সংগ্রামে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশের মুক্তি। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস তিনি সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন। অনেক সাহসি মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে তাঁর অবদান অনেক।

ছাত্র অবস্থায় তিনি অসহায়, দুঃস্থ, নির্যাতিত, নিপিড়িতদের পাশে থেকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন । তিনি মহিলাদের আইন ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে শহর ও গ্রামসহ সকল পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। নিজ হাতে আর্থিক সহায়তা, আইনী সহায়তা, গরীব-দুঃখীদের সেবা সহায়তা দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। মমতাজ বেগমের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনার মাধ্যমে মহিলাদের কল্যাণ ও অর্থসামাজিক উন্নয়নে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এসব কর্মকান্ডে অবশ্যই তিনি প্রশংসার দাবীদার। মমতাজ বেগমের দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অবদানের ফলশ্রুতিতেই জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান পদে পদায়ন করেন। তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত থেকে

Dhaka University Institutional Repository
জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং রাজনীতিবিদ ব্যক্তিত্ব মেহের আফরোজ চুমকির দিক নির্দেশনায় দেশব্যপী নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যা দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সেলিনা হোসেন, অজয় দাশ গুপ্ত ও রোকেয়া কবির, *সংগ্রামী নারী* যুগে যুগে (প্রথম খন্ড), (ঢাকা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ১৯৯৮) পৃ. ১৯৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪, ১৯৫।

৩. মোতাহার হোসেন মাহবুব, *যুদ্ধদিনের কথা* (ঢাকাঃ বিনয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৭) পৃ. ৪১।

৪. দৈনিক সংবাদ, ৩ মার্চ ১৯৭১, পৃঃ ১।

৫. দৈনিক সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১, পৃঃ ১।

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ ১৯৭১, পৃঃ ১।

৭. মোতাহার হোসেন মাহবুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, ৪১।

৮. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১১) পৃ. ১৪৬।

৯. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, *নরীর ক্ষমতায়ন ঃ রাজনীতি ও আন্দোলন*, (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩) পৃ. ২২ ও ২৩।

১০. মমতাজ বেগম ০২-০১-২০১৪ ও ০৭-০১-২০১৪ দুপুর ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ১৩-০১-২০১৪ তারিখে দুপুর ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সাক্ষাতকার দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

বাংলাদেশে স্বাধীকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার সাথে জড়িয়ে আছে অনেক নারীর নাম। তাঁদের মধ্যে জাহানারা ইমাম এমন একজন মহান নারী ছিলেন যাঁর প্রতিবাদী চেতনা জনগণকে সংগঠিত করেছিল। স্বাধীনতা বাঙালী জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অর্জন কিন্তু এই বাঙালি জাতির মধ্যেই কিছু স্বার্থান্বেষী ছিল যারা কুখ্যাত হয়ে আছে তাদের কর্মের জন্য। তারা হলো রাজাকার, আল বদর, আল শাম্স, শান্তি কমিটির লোকজন, এরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষ হয়ে বাঙালীদের হত্যা, ঘরবাড়ি পোড়ানো ও নারীদের উপর নির্যাতন করেছে। ইতিহাসের পাতায় তারা ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়ে আছে। এই রাজাকারদের কারণেই নিহত হয়েছিলেন জাহানারা ইমামের স্বামী ও সন্তান, জাতির কাছে তিনি এই ঘৃণিত চক্রের বিচার চেয়েছিলেন। জনতার আদালতে তাঁর এই বিচারের আয়োজন সার্থক হয়েছিল , তিনি হয়েছিলেন সবার শ্রদ্ধেয়। স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ, আমরণ সংগ্রাম অমর হয়ে থাকবে। শাহ এ এম এস কিবরিয়া শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাঙ্গালী জাতির জীবনের একটা সংকটময় সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সাহসের সত্যি তুলনা নেই। প্রতিপক্ষের প্রবল পরাক্রম সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই কোন প্রতিপক্ষ পথ রোধ করতে পারেনি। দেশের প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি একটা আধুনিক, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছেন।[১]

৩.১ জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে ১৯২৯ সালের ৩ মে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে রংপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন (বর্তমান-এস.এস.সি) ১৯৪৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (এইচ.এস.সি) এবং ১৯৪৭ সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। জাহানারা ইমাম ১৯৬০ সালে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ার সানডিয়াগো ষ্টেট কলেজ থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করেন। জাহানারা ইমাম একজন শিক্ষক, সাহিত্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে পরিচিত। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের উত্থানে সামরিক শাসনের কূপমন্ডূকতার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যখন ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছিল, ঠিক তখনই পুর্নজাগরণের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আবির্ভাব ঘটে জাহানারা ইমামের। জামায়াতের সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জাহানারা ইমাম।[২] ১৯৮১ সালের ২৫ মে বায়তুল মোকাররাম প্রাঙ্গণে এই কমিটির উদ্যোগে বিশাল জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডা. আহম্মেদ

Dhaka University Institutional Repository
শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা জাহানারা ইমাম তাঁর বক্তৃতা দেয়ার সময় সমাবেশে আগত মুক্তিযোদ্ধারা সমস্বরে শ্লোগান দিতে থাকেন 'মাগো তোমায় কথা দিলাম, অস্ত্র আবার হাতে নেব, মুক্তিযোদ্ধার হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার'। জাহানারা ইমামের বক্তৃতায় সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সন্তান সম্বোধন করে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।[৩]

১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাহানারা ইমামকে মহিলা বিষয়ক উপদেষ্টা করতে চেয়েছিলেন, তিনি তা গ্রহণ করেননি। ১৯৮৬ সালে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে জামায়াত ইসলাম সংসদ নির্বাচনে ১০টি আসন লাভ করেছিল এবং তাদের ফ্যাসিষ্ট কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছিল। তখন সচেতন বুদ্ধিজীবিরা ২ জুন ১৯৮৮ সালে 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছিলেন। জাহানারা ইমাম এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এটি ছিল ফ্যাসিষ্ট জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন। 'রাজনৈতিক দলগুলো তখন এরশাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যতটা আগ্রহী ছিল জামায়াতে ইসলামীসহ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে ততটা আগ্রহী ছিল না। ১৯৯১-এর নির্বাচনে জামায়াত গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ভোটে অংশ গ্রহণ করেছিল। তখন তাদের চরিত্র উন্মোচনের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নাগরিক কমিটি ও শহীদ পরিবারবর্গ। গত বারো বছরে গোলাম আযমের জামায়াত ইসলামীর পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। তবে নানা কারণে সবচেয়ে বেশি জণসমার্থন ও গণজোয়ার সৃষ্টি করেছে ১৯৯২ এর কর্মসূচী।[৪]

১৯৮২ সালে জাহানারা ইমাম ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ১৯৯১ সালে ২৯ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী দল গোলাম আজমকে দলের আমীর ঘোষণা করে। মরণব্যধি ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অন্য আরেকটি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন জাহানারা ইমাম। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতার কারণে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ৭১-এর ঘাতক দালাল রাজাকার আল বদরদের ক্রমশঃউত্থান তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। জাহানারা ইমাম, আশ্চর্য সাংগঠনিক দক্ষতায় ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী-মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি উত্থানের বিরুদ্ধে মাথা উচুঁ করে দাঁড়ালেন।[৫] ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয় ।[৬] শুরু হয় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক ব্যতিক্রমধর্মী ধারা। দেশের লাখ লাখ মানুষ শামিল হন এই আন্দোলনে। এই অধ্যায়ে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন রচিত হয়েছিল, তা তাঁর দু'জন সহযোগীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই দু'জন সহযোগী হলেন সংগঠনের সহ সভাপতি শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী এবং অপরজন সংগঠনের নারী বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা সালমা হক। তাঁদের বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ২০০২ সাল থেকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাসা নং- ৬৬, সড়ক নং- ৭এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ এ ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ডা: আলীম চৌধুরী (১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ আলবদর কর্তৃক অপহৃত হন এবং তাকে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়)। মুক্তিযুদ্ধের সময় আলীম চৌধুরী ও শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী বিপদগ্রস্ত মানুষকে আশ্রয় দেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে ব্যান্ডেজ দিয়ে রোগী সাজিয়ে রাখা হত এবং ডা: আলীম চৌধুরী পরে তাঁদের অস্ত্রসহ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতেন। তাঁরা অর্থ ও ঔষধ সংগ্রহ করে নিজেদের গাড়ি করে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এছাড়াও একটা গোপন হাসপাতাল ছিল যেখানে আলীম চৌধুরী ও অন্যান্য ডাক্তাররা মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩৬ বছর অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন কিন্তু বি.এন.পি সরকার তাঁকে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত করেন। এরপর তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মিলে লালমাটিয়ায় 'উদ্দীপন বিদ্যালয়' নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গোলাম আযম ছিল একজন যুদ্ধাপরাধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী লোক। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানী সেনাদের সবরকম সহযোগিতা সে-ই করেছিলো। বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নক্শাও তারই তৈরি। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে সে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। গোলাম আযম বে-আইনিভাবে বাংলাদেশে অবস্থানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলো।

১৯৭৮ সালে গোলাম আযম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী এবং পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী দলের আমীর ঘোষণা করা হয়। 'জামায়াতের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ১৯৯২-৯৪ কার্যকালের জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম আমীর নির্বাচিত হয়েছেন'।[৭] 'সংবিধান লঙ্ঘন করে জামায়াত ইসলামী তাদের নেতা পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করলে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, 'ওয়াকার্স পার্টি, জাসদ, সাম্যবাদী দল, জাতীয় পার্টি, সোস্যালিষ্ট পার্টি, ওসমানী কল্যাণ সংস্থা, ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় বিদেশী একজন নাগরিক দেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। সবার পক্ষ থেকে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিস্কারের আহ্বান জানান হয়'।[৮] জামায়াত নেতা গোলাম আযমের উত্থানে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ উদ্বিগ্ন হয়। তাঁরা ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। সবাই মিলে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাহানারা ইমাম ছিলেন অসীম সাহসী নারী। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যুক্ত না হয়েও তিনি মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে নিজ ঘরে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে গেছেন এবং যুদ্ধ জয়ের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন । নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন যুদ্ধের ময়দানে। তাঁদের বাসাটি সে সময় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ রুমীর মা হিসাবে জাহানারা ইমামকে মা ডাকেন। এজন্য বুদ্ধিজীবীরা বেগম সুফিয়া কামালের প্রস্তাবে একমত হন যে, জাহানারা ইমামকে প্রধান করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হবে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারী ১০১ সদস্য বিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয়। জাহানারা ইমামের প্রতি দেশের সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগ জাতীর এক গৌরবের বিষয়। 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমীর মা হিসেবে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্নভাবে গেরিলাদের সাহায্য করেছেন। তখন থেকেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন'।[৯] ১৯৯২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীর সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।

সমন্বয় কমিটি গঠিত হবার পর জাহানারা ইমাম টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন এবং জনসাধারণ ও দলকে সংগঠিত করেছেন । তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, শারিরীক অসুস্থতা উপেক্ষা করে গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। একাধিক জনসভা, মিছিল, মানববন্ধন ইত্যাদি করে এক সুদৃঢ় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন মিটিং আলাপ আলোচনা ও পরিকল্পনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ২৬ মার্চ ১৯৯২ গণ আদালতে গোলাম আযমের বিচার করা হবে। জাহানারা ইমামের সঙ্গে আলোচনায় এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদশের যে কোন স্থানে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে বা বিদেশী দূতাবাসে গোলাম আযম উপস্থিত থাকলে তা বয়কট করা হবে। এ ব্যাপারে সর্বাত্মক ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের প্রতিও আহ্বান জানান হয়।[১০] ফেব্রুয়ারীর এক তারিখ থেকে গণ-স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। ৫০ দিনের ভিতর ২০ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। শুধু স্বাক্ষর নয় বহু শ্রমজীবী মানুষ স্বাক্ষর সংগ্রহকারীদের বক্তব্য শুনে টিপসই দিয়েছেন। তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে দেশ ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত মানুষ মুক্তহস্তে চাঁদা দেন । জাহানারা ইমাম শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নির্মূল কমিটির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সই দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা বক্তব্য পড়ে বললেন "এটা আমার কাছে রেখে যান, আমি একা কেন অন্য সব সংসদ সদস্যের সই সংগ্রহ করে দেব" এভাবে সংসদ সদস্যদের সমর্থন আদায় করা হয়েছিল। মার্চের প্রথম দিকে জাহানারা ইমাম তাঁর কাজের সুবিধার জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেন। এ ষ্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে গোলাম আযমের বিচারের জন্য গণ-আদালতের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনের পাশে গণ-আদালত বসে খোলা ট্রাকের

Dhaka University Institutional Repository
উপর। সকল বিচারকের উপস্থিতিতে এই আদালতের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ২৬ মার্চ ১৯৯২ সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ১২জন বিচারকের সমন্বয়ে এই বিচার কার্য হয়।

গোলাম আযমের বিরুদ্ধে বিচারের বিষয়সমূহ হল:

১। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে ৩০ লাখ নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা এবং দু'লাখ নারী অপহরণ ও ধর্ষণের সহায়তা করে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছেন?

২। অভিযুক্ত গোলাম আযমকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আল বদর, আল শামস গঠন করে এবং তার অনুগত রাজাকার বাহিনী দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে দু'লাখ নারীকে অপহরণ এবং ধর্ষণে ও শ্লীলতাহানিজনক অপরাধ সংগঠন করতে সাহায্য করেছেন ?

৩। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকিস্তানী বাহিনীকে গণহত্যার উস্কানি এবং প্ররোচনা দান করেছেন?

৪। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি আল বদর, আল শামস বাহিনী গঠন করে তাদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীহ পরিবার পরিজনের ওপর সশস্ত্র ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছেন ?

৫। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ানোর লক্ষ্যে ধর্মের নামে বিকৃত ব্যাখা প্রদান করে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মের নামে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এবং এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে ?

৬। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি তাঁর নিজস্ব অনুগত বাহিনী আল বদর, আল শামস ও রাজাকার বাহিনী দিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করে অসংখ্য জনপদ ধ্বংস করে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠন করেছেন?

৭। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এই দেশে ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তাঁর অনুগত বাহিনী আল বদর ও আল শামসকে দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছেন?

৮। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছে?

৯। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচারকার্য চালিয়ে মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছেন?

১০। অভিযুক্ত গোলাম আযম কি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তাঁর অনুগত আল বদর, আল শামস বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে জঘন্যতম মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছেন?[১১]

গণ-আদালতের বিচারের দিন ফরীয়াদি পক্ষের ১৫জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্তের পক্ষে গণআদালতে নিযুক্ত ছিলেন এডভোকেট মোঃ নজরুল ইসলাম। গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository
আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যেহেতু গণ-আদালত একটি প্রতীকি আদালত, এই আদালত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর করে না সেহেতু অভিযুক্ত গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর অপরাধ মৃত্যুদন্ড যোগ্য বলে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানান হয়।২৮ মার্চ ১৯৯২ সরকার গণ-আদালতের ২৪জন অংশ গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মামলা করেন। গণ-আদালতের ২৪জনের বিরুদ্ধে কোর্টের গ্রেফতারি পরোয়ানা শিরোনামে ২৯ মার্চ ১৯৯২ দৈনক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়- জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করেছেন।[১২] পরবর্তীতে হাইকোর্ট হতে তাঁরা জামিন লাভ করেন। 'গণ-আদালতের সাফল্যের পর জাহানারা ইমাম আরো আত্মবিশ্বাসী হন। শক্ত হাতে তিনি আন্দোলনের হাল ধরেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একের পর এক বিশাল জনসভা করেন । বাংলাদেশের সর্বত্র আন্দোলনের ব্যপকতা লাভ করে ।[১৩]

লাখো জনতার পদযাত্রার মাধ্যমে জাহানারা ইমাম ১৯৯২ সালের ১২ এপ্রিল গণ-আদালতের রায় কার্যকর করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী ১০০ জন সাংসদ গণ-আদালতের রায়ের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করলে আন্দোলনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। দৈনিক সংবাদ ১৩ এপ্রিল ১৯৯২ সালের পত্রিকায় গণ-আদালতের রায় কার্যকর করতে নির্মূল কমিটির দাবি শিরোনামে বলা হয়-

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমামসহ ১০জনের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল রোববার সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার এবং বিরোধী দলের নেত্রীর সাথে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন। স্মারকলিপিতে গত ২৬ মার্চ গণ আদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যে রায় দেয়া হয়েছে সরকার যেন তাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন এই বিষয়ে আহ্বান জানান হয়।[১৪] একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেগবান হচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে বিএনপি সরকার ৩০ জুন ১৯৯২ সালে সংসদে বিরোধীদলের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। বিরোধী দলের ৪ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে-

(১) গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা প্রত্যাহার।

(২) অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার।

(৩) বিরোধীদলের সঙ্গে আচার আচারণে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ।

(৪) গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে ৪ দফা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ধন্যবাদ জানান।[১৫] ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ গণ-আদালতের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি পর্যায়ক্রমিকভাবে একাত্তরের শীর্ষস্থানীয় ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ উদঘাটনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। প্রথম পর্যায়ে যে আটজন ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তারা হলেন- (১) আব্বাস আলী খান (২) মতিউর রহমান নিজামী (৩) মোঃ কামারুজ্জামান (৪) আব্দুল আলীম (৫) দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (৬) মোঃ আব্দুল মান্নান (৭) আনোয়ার জাহিদ এবং (৮) আব্দুল কাদের মোল্লা। বেগম সুফিয়া কামালকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যের তদন্ত কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমাবেশ হয়। সমাবেশে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। পুলিশের লাঠিচার্জে জাহানারা ইমাম আহত হন ।[১৬] রাজ-পথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, তখন তাঁকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত এই নেত্রীর প্রতি লিফ্টম্যান থেকে শুরু করে সর্বপর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ ও চিকিৎসকরা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় তিনি সুস্থ হলেও পায়ের সমস্যা থেকে যায়। এর পর থেকে তিনি লাঠি হাতে নিয়ে চলাফেরা করতেন। এ অবস্থায়ও তিনি আন্দোলনের সাথে এবং মানুষের পাশে থেকেছেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণ-আদালতের ২য় বার্ষিকীতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের সামনে রাজপথে বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাবেশে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বেগম সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন।[১৭]

শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তথা এই আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবে - একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন গণ-আদালত তথা এই আন্দোলন ছিল সু-নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জামায়াত ইসলামের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ছিল এই আন্দোলন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্যবৃন্দ কোন প্রাপ্তির জন্য নয়, ক্ষমতার লোভে নয়, দেশের মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। এই আন্দোলনের প্রধান নেত্রী জাহানারা ইমাম, একজন মহীয়সী নারী এবং আমাদের আদর্শ। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি লক্ষ্যে অটল ছিলেন। ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করে কিন্তু তিনি ভীত হন নি, সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ১৯৯৬ সালে তাঁর রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

সৈয়দা সালমা হক ২০১০ সাল থেকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নারী বিষয়ক সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। স্বামী ডাঃ আজহারুল হককে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দা সালমা হক ও আজহারুল হক দু'জনে মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা অনেক বিপদগ্রস্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারে সালমা হক বলেন, গোলাম আজম বাংলাদেশের একজন যুদ্ধাপরাধী। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সরকারের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশে নির্মম গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে গোলাম আযম সবরকম সাহায্য সহযোগিতাই করেছে।তিনি আরো বলেন- বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন সারা দেশজুড়ে নির্বিচারে নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা ও নির্যাতন করেছে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে গোলাম আজম ও তার দল জামায়াতে ইসলামী তাদের শুধু সমর্থনই জানায়নি, নিজেরা উদ্যোগী হয়ে তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একই ধরনের অপরাধ করেছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যায়ও গোলাম আজমের সহযোগিতা ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকে গোলাম আজম বিরোধীতা করেছিল। ১৯৭১ সালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই ছিল লক্ষ্য। ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গোলাম আজম। তার উদ্দেশ্য ছিল পুনরায় জামায়াত ইসলামকে পুর্নগঠিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় গোলাম আজমকে ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর জামায়াত ইসলাম দলের আমীর ঘোষণা করা হয়। সালমা হক বলেন "একাত্তরের ঘাতক ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী গোলাম আজমকে দলের আমীর হিসেবে ঘোষণা করা হলে সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের চিরশত্রুদের ঔদ্ধত্যে খুব অবাক হয়েছিলাম।আইন অমান্য করে জামায়াত ইসলামী পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আজমকে দলের আমীর ঘোষণা করায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন এর প্রতিবাদ করে।

৩ জানুয়ারী ১৯৯২ সালে বাংলার বাণী পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে আওয়ামীলীগ নির্বাহী কমিটির সভার প্রস্তাবে 'পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আজমকে জামায়াতের আমীর ঘোষণা করায় গভীর উদ্বেগ নিন্দা, ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, যে মুহুর্তে একজন বিদেশী নাগরিক একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে সেই মুহুর্ত থেকে দেশের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার শামিল বলে বিবেচিত হয়'।[১৮] স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামী দলের আমীর নির্বাচিত করাকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদে তুমুল বাক-বিতন্ডা ও হৈচৈ হয়।[১৯]

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী সমাজের সম্মতিক্রমে গঠিত হল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। বেগম সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমামকে এই কমিটির প্রধান করার জন্য প্রস্তাব করলে সকলে সে প্রস্তাবে সম্মতি দেন। "সচিত্র সময়" পত্রিকায় 'মূল ধারায় চলেছি' লেখায় জাহানারা ইমাম বলেন যে- 'আগামী ২৬ মার্চ ১৯৯২ স্বাধীনতার ২১ তম বার্ষিকীর দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশিষ্ট নাগরিক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্রকাশ্য গণ আদালতে গোলাম আজমের বিচার হবে'।[২০] গোলাম আজম তথা জামায়াত ইসলামীর ফ্যাসিস্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে জাহানারা ইমামের প্লাটফর্মে দেশের জনগণ একত্রিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী নাগরিক ও একাত্তরের ঘাতক গোলাম আজম ও তার সহযোগী সকল ঘাতক দালালদের বিচারের দাবিতে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে শহিদ তাহের মিলনায়তনে জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।[২১] নির্মূল কমিটি গঠনের পরে সারা দেশ থেকে অকল্পনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা আসছিল। এভাবে জাহানারা ইমামের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ২৬ মার্চ গোলাম আজমের বিচারের জন্য গণআদালতের কর্মসূচী আমরা সফল করতে পারব। জাহানারা ইমামের সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল, নিজের কাজের সুবিধার জন্য তিনি একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির মাধ্যমে ২৬ মার্চের আয়োজনের জন্য সকল কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। 'কোন্ কাজ কাকে দিয়ে কিভাবে আদায় করে নিতে হয় সে কৌশল তিনি ভাল মত রপ্ত করেছিলেন। এমনকি শেখ হাসিনাও তাঁর কোন অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি'।[২২] ২৬ মার্চ ১৯৯২ গণআদালতের কাজকে সফল করার জন্য গণস্বাক্ষর, লিফলেট, পোস্টার ছাপানো, বিভিন্ন তহবিল গঠন ইত্যাদি কাজ দ্রুত গতিতে চলছিল। জাহানারা ইমাম শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলে সংসদ সদস্যদের মতামতও সংগ্রহ করেন।

সালমা হক বলেন, ২৬মার্চ গণআদালতের কার্যক্রম সফল করার জন্য নির্মূল কমিটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনগুলো প্রতিনিয়ত সভা ও সমাবেশ করছিল। অসুস্থ হয়েও জাহানারা ইমাম বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ১৯৯২ সালের ২ মার্চ 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় 'জামায়াতের চক্রান্ত না রুখলে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়- একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে এক গণজামায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমাম গোলাম আজমের বিচারের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘাতক দালালদের প্রতিহত করার আহ্বান জানান। গণ জমায়েত শেষে গণমিছিল বের করা হয়।[২৩] একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমাবেশ শিরোনামে ৪ মার্চ ১৯৯২ বুধবার দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে- মঙ্গলবার বায়তুল মোকাররামের দক্ষিণ গেটে গোলাম আজমের বিচারের দাবিতে আয়োজিত হাজার হাজার মানুষ-এর সমাবেশে বেগম সুফিয়া কামাল, শেখ হাসিনা ও জাহানারা ইমামসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতারা বক্তৃতা করেন। গোলাম আজমের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য সকলে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে বিক্ষোভকারীরা গোলাম আজমের কুসপুত্তলিকাসহ মিছিল নিয়ে শহিদ মিনারে যান। এভাবে ২৬ মার্চের কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়া হয়। সালমার কাছ থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে ২৬ মার্চ গণআদালতের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। আদালতের প্রাথমিক বৈঠক হাইকোর্ট ভবনেই বসেছিল। জাহানারা ইমামের দুইপাশে সোফায় বিচারকরা বসেছেন, সামনের চেয়ারে অভিযোগকারী, সাক্ষী আর আইনজীবীরা বসেছেন। এখানে সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাকসহ তাঁর সংগঠিত দল 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র অন্যান্য নেতারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা বলেছিলেন মঞ্চ তৈরি হলে খবর পাঠাবেন। গাজিউল হক গণআদালতের পটভূমি ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হলো। জাহানারা ইমামের পক্ষ থকে গাজিউল হক গণআদালতের রায় পড়ে শোনালেন। রায়ের কপি বিচারক মন্ডলীর হাতে ছিলো। প্রথমে জাহানারা ইমাম ও পরে অন্যান্য সদস্যরা সই করেছিলেন। এভাবে চূড়ান্ত হয়েছিল গণআদালতের ঐতিহাসিক রায়।

সকাল সাড়ে দশটার সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে খবর আসার পরে জাহানারা ইমামসহ সকল নেতা কর্মীরা রওনা হন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পরিণত হয় জনসমুদ্রে। সেখানে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল ট্রাক দিয়ে। সেচ্ছাসেবকদের একটি দল গাছের ছায়া পড়েছে এমন এক জায়গা থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে জাহানারা ইমামের বসার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য বিচারকদের সঙ্গে তিনি মাটিতেই বসেছিলেন। চারপাশে গাছে গাছে তখনও মাইক বাধা হচ্ছিল। সাংবাদিকদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল জনসমুদ্রের ছবি ক্যমেরা বন্দি করতে। ভিড় ক্রমঃশ বাড়ছিল। রাজনৈতিক দলের নেতারাও মঞ্চের পাশে উপস্থিত ছিলেন। 'আওয়ামীলীগের সাজেদা চৌধুরী, আবদুল জলিল এবং আরো কয়েকজন এসে জাহানারা ইমামের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সভানেত্রীর একটি চিঠি তাঁর হাতে দিয়েছিলেন'।[২৪]

মঞ্চ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের জায়গায়। মাইক কাজ করছিলনা, তখন ঠিক করা হল জাহানারা ইমাম রায় পড়বেন সঙ্গে সঙ্গে লোকমুখে সেটা রিলে করা হবে। বারোটা পাঁচ মিনিটে জাহানারা ইমাম রায় পড়া আরম্ভ করলেন, বারোটা কুড়ি মিনিটে রায় পড়া শেষ হল। সবশেষে বলা হয় যেহেতু গণআদালত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর করে না, সেহেতু অভিযুক্ত গোলাম আযমকে আমরা দোষি সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি। এটি ছিল মূলত একটি প্রতীকি আদালত। এই আদালত আইন হাতে নিয়ে কোন বিচার কার্যকরের ব্যবস্থা করে না। ২৬ মার্চ গণ-আদালতের কাজ সফলভাবে শেষ হওয়ার পর সরকার জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁরা জামিন পান। ১ এপ্রিল ১৯৯২ দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের বিতর্কিত আমীর গোলাম আজমের বিচারের প্রশ্নে চেয়ারম্যান মিসেস জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের জামিন মঞ্জুর করেছে।[২৫]

গণআদালতের সফলতায় জাহানারা ইমাম আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। শহীদ রুমীর মা এভাবে রূপান্তরিত হলেন দেশ জননীতে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শক্তি কর্নেল জামানের নেতৃত্বাধীন নির্মূল কমিটি প্রায় প্রতিদিন মিটিং, মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছে চলমান আন্দোলনের গতি ধারা।[২৬] শাহবাগ চত্বরের বিশাল সমাবেশে জাহানারা ইমাম শিরোনামে দৈনিক সংবাদ এর ১ জুলাই ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository
সালে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে জাতীয় সংসদ অভিযাত্রার সমাবেশে জাহানারা ইমাম বলেন, "গণআদালতের রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবো না।" বক্তৃতায় ১৪ অক্টোবরে ঢাকার মহাসমাবেশসহ সমন্বয় কমিটির সাড়ে ৩ মাসের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে আছে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে গণরায় কার্যকর ও অন্যান্য দাবিতে সারা দেশে সভাসমাবেশ, মিছিল ও গণস্বাক্ষর অভিযান অব্যাহত রাখা, ১৯ জুলাই প্রতিটি উপজেলায় সমাবেশ ও ঘেরাও, ২৩ আগষ্ট সকল জেলা কেন্দ্রে সমাবেশ ও ঘেরাও, ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিনিধি সম্মেলন এবং ১৪ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ।[২৭]

এভাবে আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে। জাহানারা ইমাম ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী একের পর এক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ গণআদালতের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি পর্যায়ক্রমিকভাবে একাত্তরের শীর্ষস্থানীয় ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ উদঘাটনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বেগম সুফিয়া কামালকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদ্যস্যর তদন্ত কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউটের সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই জন সমাবেশে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান বেগম সুফিয়া কামাল জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন।জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির যে আন্দোলন এ সম্পর্কে সৈয়দা সালমা হক বলেন যে-

বাংলাদেশে জামায়াত শিবির ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নির্মূল করার জন্য জাহানারা ইমাম যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরল ঘটনা। ক্ষমতায় যাবার জন্য নয় অথচ ক্ষমতায় কে যাবে সেটা নির্ধারণের জন্য ও মানুষের চেতনায় উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন আন্দোলন সমকালের ইতিহাসে দেখা যায় না। এ আন্দোলন নিছক সমাজ সংস্কারের কিংবা রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর পরিধি ব্যাপক ও প্রভাব সুদূর প্রসারী। জাহানারা ইমাম এবং সহযোগী যোদ্ধারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বিচারবোধ এবং ন্যায়বোধকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে প্রথিত করে একটি আন্দোলনকে সারাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে হত্যা মনুষ্যত্ব বিরোধী অপরাধ এবং মনুষ্যত্ববিরোধী অপরাধের বিচার সভ্যবোধেরই প্রকাশ।[২৮]

জাহানারা ইমাম রাজনীতিবিদ ছিলেন না, অথচ আশ্চর্য জনক ভাবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই নারী রাজনীতির একটি অমীমাংসিত অধ্যায় উন্মোচিত করে রাজপথে নেমে গেলেন। কণ্ঠ এবং পদক্ষেপ মেলালেন সহস্র মানুষের সঙ্গে। পুলিশ তাঁকে রাজপথে আঘত করলো। রাষ্ট্র তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিল। তবুও এই মানুষটি দেহের ক্যান্সার নিয়ে রাজনীতির ক্যান্সার দূর করবার জন্য আমৃত্যু লড়ে গিয়েছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়

Dhaka University Institutional Repository
'একজন নাগরিক সরকার বিরোধী হলেই রাষ্ট্রদ্রোহী হতে পারেন। যুগে যুগে এই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা রাষ্ট্রদ্রোহী খেতাব পেয়েছিলেন'। [২৯] জাহানারা ইমাম শারিরীক অসুস্থতার কারণে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালে যান। জাতীয় গনতদন্ত কমিশনের রিপোট প্রকাশের জন্য ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। এ সময় খুব দ্রুত তার শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর তিনি বললেন ক্যান্সার আরো ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন, যতদ্রুত সম্ভব তিনি যেন আমেরিকা চলে আসেন। ম্লান হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা যেন আমাকে এই কাজটুকু করার জন্য এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন'। [৩০] ১৯৯৪ সালের ২ এপ্রিল চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালের উদ্দ্যেশে রওয়না দেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩১]

তাঁর মৃত্যুতে ফরহাদ মাজহার তার জয় হোক নিবন্ধে বলেছেন যে 'আমি শোকসন্তপ্ত নই আদৌ। তাঁর মৃত্যুর গৌরবে গর্বিত। এত সাহস নিয়ে মৃত্যুর মোকাবেলা করা অনেক বড় কাজ। তিনি বাংলার জনগণকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর জয় হোক'। [৩২] মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু বাণী দিয়ে যান।

প্রিয় সহযোদ্ধারা, গত তিন বছর ধরে আপনারা গোলাম আযম ও তার সহযোগী ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের এবং স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। বাঙ্গালী জাতির প্রেক্ষাপটে আপনাদের একতা এবং সাহস ছিলো অতুলনীয়। আমাদের এই সংগ্রামের শুরুতে আমি আপনাদের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিলো, যতক্ষণ না লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলবে। মরণব্যাধি কান্সারে শয্যাশায়ী হয়ে আমি আমার জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছি। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। আমি লড়াই থেকে পিছু হটিনি কিন্তু মৃত্যুর দিকে এই অবশ্যম্ভাবী যাত্রা আমি ঠেকাতে অক্ষম। সে কারণেই আমি লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শপথটা আপনাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই এই অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। আপনাদের অবশ্যই একতাবদ্ধ থাকতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। যদিও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারব না কিন্তু নিশ্চিত জানব- আমার লাখো বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে- একটি স্বাধীন সোনার বাংলায় আপনাদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে বাস করছে। আমাদের সামনের পথ এখনও দীর্ঘ এবং বন্ধুর। এই যুদ্ধে আমরা সর্বস্তরের জনগণকে পাশে পেয়েছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা, নারী, ছাত্র এবং যুবকরা এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। আর আমি জানি জনগণের চেয়ে দৃঢ়চেতা আর কেউ নয়। জনগণই সব শক্তির মূল। তাই আমি গোলাম আযম এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ভার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব তুলে দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের হাতে- বাংলাদেশের জনগণের হাতে। নিশ্চিত জানবেন, জয় আমাদের হবেই- জাহানারা ইমাম।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের রক্ষণশীল বাঙ্গালি মুসলিম পরিবারে জন্ম জাহানারা ইমামের। বাবা সৈয়দ আব্দুল আলী, মা সৈয়দা হামিদা বেগম। বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর মা ছিলেন গৃহিণী। পারিবারিক নাম জাহানারা বেগম ওরফে জুডু। সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। সুন্দর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাহানের হাত-তক্তি বা হাতেখড়ি হয় সুন্দরপুরের হাফেজ সাহেবের কাছে। খড়ি মানে 'চক' আর তক্তি মানে কাঠে তৈরী শ্লেটের মত। লম্বাটে কাঠের শ্লেটের মাথায় ধরার জন্য ছোট্ট একটি কাঠের টুকরা লাগান থাকে। এই তক্তিতে খড়ি দিয়ে জাহানের হাত ধরে ধরে হাফেজ সাহেব আরবি বর্ণমালা আলিফ - বা - তা লিখিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে বাংলা ও ইংরেজি শেখানো হলো। সাতক্ষীরায় থাকাকালিন সময়ে তিনি প্রথম পাঠশালায় ভর্তি হন।

বাবার বদলির সুবাদে জাহানারা কোন জায়গাতেই সুস্থির ভাবে পড়াশুনা করতে পারেন নি। কখনো একই বছরে দু'টো ক্লাস করতে হয়েছে। তিনি ক্লাস ফোরে পড়তেন ঠাকুরগাঁয়ে থাকাকালীন। ক্লাস সিক্সে পড়তেন কুড়িগ্রামে থাকাকালীন। তাঁর কাছে ইংরেজি আর অংক কঠিন লাগতো বেশ তাই ক্লাস সিক্সে পরীক্ষা দিয়েই ঘোষণা করেন পড়াশুনা করবেন না আর। মা-বাবার বকুনি খেয়েও প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন জাহানারা ইমাম। জাহানারার এক মটকা চাচা ছিলেন নাম আব্দুল ওয়াহেদ আহম্মেদ এবং তিনি তাঁর বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি জাহানারাকে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিতের ছবি দেখিয়ে অনুপ্রাণিত করেন। জাহানারা বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের মতো লেখাপড়া করতে আগ্রহী হন। (বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত ছিলেন, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বোন। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দানে পটু কথাবার্তায় চৌকস)।

কুড়িগ্রামে মেয়েদের স্কুল ছিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। ছেলেদের স্কুলে ৭ম শ্রেণির রেজিষ্ট্রারে জাহানারার নাম ছিল কিন্তু স্কুলে যেতে হতো না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে আসলেই হতো। শিক্ষকের পরামর্শে ৮ম শ্রেণিতে বই না কিনে ৯ম শ্রেণির বই কিনে দেওয়া হলো তাঁকে। সিদ্ধান্ত হলো, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির বই দু'বছর ভালভাবে পড়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবেন। তখন তাঁরা কুড়িগ্রামে থাকতেন। সেখানে শহরে মেয়েদের কোন হাইস্কুল ছিলনা। চাচা ও শিক্ষকের কল্যাণে দস্তয়ভস্কি, টলষ্টয় প্রভৃতি লেখকের বইয়ের বাংলা অনুবাদ পড়া ও বাড়িতে বিভিন্ন রকম পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান। জাহানারার পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল রংপুর গার্লস হাইস্কুলে, সেখান থেকে তিনি পরীক্ষা দেন এবং ১৯৪২ সালে ২য় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে জাহানারার বাবা রংপুরে বদলি হন। এখানে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। তখন মেয়েরা পড়াশুনা কম করতো বলে জাহানারাকে নিয়ে রংপুর শহরে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও বোরখা পরতেন না। তিনি সাদাশাড়ি, পুরোহাতা ব্লাউজ এবং মাথায় সাদা ওড়না পরে কলেজে যাতায়াত করতেন। একই কলেজে জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমাম বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন। উনার সঙ্গে জাহানারার আগেই পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল, পরে বন্ধুত্ব। ১৯৪৫ সালে জাহানারা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর কলকাতার লেডি ব্রেবোন কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা টিচার্সট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পার্ট ওয়ান পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ায় সানডিয়াগো ষ্টেট কলেজ থেকে সার্টিফিকেট ইন-এডুকেশন ডিগ্রী অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান বলে এম.এ পার্ট-টু পাশ করলেন ১৯৬৫ সালে।

জাহানারা ইমামের দাদা ও নানা ছিলেন সহোদর ভাই । তঁদের আদি নিবাস পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার, বড়ঞা থানার, সুন্দরপুর গ্রামে। জাহানারার দাদার নাম ছিল সৈয়দ ফজলুর রহমান, দাদি নাসিমুন্নেসা বিবি। জাহানারার ২ চাচা ৪ ফুপু। বড়চাচা সৈয়দ রেজা আলী বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুন শহরে জেনারেল পোষ্ট অফিসে চাকরি করতেন। মেঝো চাচা আব্দুল হাই কান্দি মহকুমা শহরে সিভিল কোর্টে চাকরি করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট। ফুপুরা সবাই বিবাহিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জাহানারা ইমামের চাচা ফুপুরা মুর্শিদাবাদেই থেকে যান। জাহানারা ইমামের নানা সৈয়দ আতাউর রহমান অল্প বয়সে মারা যান। জাহানারার ৫ বোন ও ৩ ভাই। বড় বোন মেহেরুন্নেসা এক বছর বয়সে মারা যান। এরপর জাহানারা ইমাম। বড় ভাই সৈয়দ ওবায়দুল আকবর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম.এ পাশ করে ইপিসিএস অফিসার হন। চট্টগ্রামে এক্সট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন। মেঝো ভাই সৈয়দ মহিউদ্দিন আহম্মেদ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নেন। তিনি কানাডায় কর্মরত থেকে সেখানেই বসবাস করেন। ছোট ভাই সৈয়দ মোস্তফা কামাল, চাটার্ড একাউন্টেন্ট, লন্ডনে পড়ালেখা করেছেন ও সেখানেই কর্মরত থেকে বসবাস করেন। জাহানারার মেঝো বোন তাহমিদা সাঈদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অর্নাস ও এম,এ পাশ করেন। তিনি একজন শিক্ষক এবং লেখিকা। তৃতীয় বোন শামসুন্নাহার আজিজ বি,এ ও বি,এড ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ৪র্থ বোন উম্মে সালমা চিসতী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম,এ পাশ করেন এবং বি,এড ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করতেন। এভাবে তাঁর ভাইবোন সকলেই ছিলেন স্বশিক্ষিত যা জাহানারা ইমামের জীবন দর্শনে প্রভাবিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ৯ আগষ্ট শরীফুল আলম ইমাম আহমেদের সঙ্গে জাহানারার বিয়ে হয়। স্বামী শরীফ ইমাম পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। শরীফ ইমাম ও জাহানারা ইমাম দম্পতির দুই ছেলে। ১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ প্রথম সন্তান শাফী ইমাম রুমী, ১৯৫৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সন্তান সাইফ ইমাম জামী জন্ম গ্রহণ করেন। শাফী ইমাম রুমী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন দুঃসাহসী গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে শহিদ হন। স্বাধীনতার পর তিনি বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত হন। জাহানারার স্বামী শরীফ ইমামকে নির্মম নির্যাতন করে পাকিস্তানি হানাদার আহত অবস্থায় মুক্তি দেয়। বিজয়ের দু'দিন আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস কেটেছে তাঁর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ত্রাসের মধ্যে। *একাত্তরের*

Dhaka University Institutional Repository
*দিন গুলি*তে তিনি প্রতিবাদী ভাষায় বলেছেন, 'ইসলামের নামে ওরা যা করছে তাতে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। খোদার ঘর মসজিদে ঢুকে কোরআন তেলওয়াতরত মানুষ খুন, মায়ের সামনে ছোট বাচ্চাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের সামনে মাকে বেইজ্জত করেছে'।[৩৩]

মুক্তিযুদ্ধের সময় জাহানারা ইমামের মনের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। দুঃসময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেন। ডিসেম্বরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে উল্লেখ করেন যে, 'সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তের দাম দিতে হয়েছে কান্নার স্রোতেও হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে'।[৩৪] যা তিনি দিনলিপি হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁর ডায়েরিতে। মুক্তিযুদ্ধের এ দিনলিপি তিনি ১৯৮৬ সালে 'একাত্তরের দিনগুলি' নামে প্রকাশ করেন।

৩.১.২ কর্ম ও সাহিত্য জীবন

জাহানারা ইমামের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মাধ্যমে। ১৯৪৮ সালে তিনি ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুলে সহকারি শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে ১৯৫২-১৯৬০ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। বুলবুল একাডেমি কিন্টারগার্ডেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে ১৯৬২-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক পদে চাকরি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি এডুকেশনাল বোর্ডের প্রতিনিধি হয়ে সিলেবাস সেমিনারে পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে যান। 'গালর্স গাইড' পাকিস্তান উইমেনস্ ন্যাশনাল গার্ড, খেলাধুলা, 'অল পাকিস্তান উইমেন্স এসোসিয়েশন'-এর সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। এছাড়াও ঢাকা বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনা করতেন। ১৯৬০ সালে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী মঞ্চে সেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করেছিলেন।[৩৫] ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লেখক হিসাবে জাহানারা ইমাম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথমে পরিচয় ছিল শিশু সাহিত্যিক হিসেবে। পরে অনুবাদ করেছেন বিদেশী সাহিত্য। ১৯৯০ সালে সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন, 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল- কিশোর উপন্যাস গজকচ্ছপ (১৯৬৮), অন্য জীবন (১৯৮৫), বীরশ্রেষ্ঠ(১৯৮৫), একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬), জীবনমৃত্যু (১৯৮৮), চিরায়াত সাহিত্য (১৯৮৯), বুকের ভিতর আগুন (১৯৯০), নাটকের অবসান (১৯৯০), দুই মেরু (১৯৯০) নি:সঙ্গ পাইন (১৯৯০), নয় এ মধুর খেলা (১৯৯০), ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস (১৯৯১) ও প্রবাসের দিনলিপি (১৯৯২)।[৩৬] তাঁর *একাত্তরের দিনগুলি* গ্রন্থের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছেন। 'শুধু বাংলাদেশে নয়, ইংল্যান্ড আমেরিকার প্রচার মাধ্যমেও একাত্তরের দিনগুলি (of Blood and Fire) আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে'।[৩৭] অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর লিখিত 'জাহানারা ইমাম এবং তাঁর জিজ্ঞাসা' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "*একাত্তরের*

Dhaka University Institutional Repository

দিনগুলি যিনি পড়েছেন, তিনি জেনেছেন জাহানারা ইমাম থেকে শহীদ জননীতে তাঁর রূপান্তরের ইতিহাস।"[৩৮]

৩.১.৩ মূল্যায়ন

জাহানারা ইমাম ছিলেন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার মা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংগঠক। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিবেদিত করেন। যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারদের বিচারের কাঠগড়ায় আনার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ডায়রিতে লিখা দিনলিপি '*একাত্তরের দিনগুলি*' তাঁর এক অনন্য সৃষ্টি। জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। ১৯২৯-১৯৯৪ এই ৬৫ বছরের জীবন তাঁর। এই সময়ের মধ্যে তিনি দেখেছেন,দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল রূপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি, ভারত বিভাগ, পাকিস্তানি শাসন, বায়ান্নর ভাষার লড়াই, চুয়ান্নর যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে জাহানারা ইমাম ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে আমরা তাঁকে পাই একজন আদর্শ লেখিকা হিসাবে আর স্বাধীনতা উত্তরকালে পাই এক ব্যতিক্রমী জাহানারা ইমামকে। যিনি হয়ে উঠেছিলেন শহিদ জননী।

১৯৯২ সালে জাহানারা ইমাম একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন কিন্তু এ থেকে কখনো পিছপা হননি। জীবনের শেষ দিনগুলোতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন তবুও তাঁর কাজের ধারা কখনও থেমে থাকেনি। কর্মীদের তিনি কখনই বুঝতে দেননি যে, কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি অন্যায়, অসত্য ও অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রাম করেছেন, ভুলে গেছেন নিজের সন্তান হারানোর দুঃখকে। জীবনের শেষ আটশ ষাট দিন তাঁকে ইতিহাসের অন্যতম সাহসী যোদ্ধার প্রতীকে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় 'জাহানারা ইমাম আর আমাদের মাঝে নেই কিন্তু যাওয়ার আগে মানুষের চেতনায় এক অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কি এক যাদুমন্ত্রে সুপ্ত মানুষকে জাগ্রত করে গেছেন। তাঁকে বড় প্রয়োজন ছিল এই দেশ ও জাতির জন্য'।[৩৯]

জাহানারা ইমামের জীবনবোধ ছিল অসাম্প্রদায়িক। আমরা সবাই মানুষ, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জীবনবোধই শান্তির পারাবত, একতাই বল এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে এখনো শোনা যায় তাঁর সমাজসেবার কথা। জাহানারা ইমাম মনে করতেন, সকল শক্তির উৎস জনতা, জনতার রায় কখনো মিথ্যা হতে পারে না। জাহনারা ইমাম কখনোই জীবনের আদর্শ থেকে সরে যাননি। জনতার হাতে তাঁর সংগ্রামের মশাল সঁপে দিয়ে গেছেন। জাহানারা ইমামের আন্দোলন নি:সন্দেহে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী আন্দোলন। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পর আব্দুল কাদের মোল্লা, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, গোলাম আযম, মোঃ কামারুজ্জামানের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে তাঁর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ পূর্ণতা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৫), পৃ.৭২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৩. সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনি, ৭ জুন ১৯৮১, পৃঃ ৮।

৪. শাহরিয়ার কবির, *গণআদালত ও জাহানারা ইমাম* (ঢাকা চারুলিপি প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৭,১৮।

৫. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৬. দৈনিক সংবাদ, ২০ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ৮।

৭. দৈনিক বাংলা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ৮।

৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ১২।

৯. লুৎফর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১০. তাহমিদা সাঈদা, *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম* (ঢাকা; বাঙ্গালী সমগ্র জাদুঘর, ২০০৪) পৃ. ১০১।

১১. শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১, ২৪২।

১২. দৈনিক বাংলা, ২৯ মার্চ ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ৭।

১৩. তাহমিদা সাঈদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮,১০৯।

১৪. দৈনিক সংবাদ, ১৩ এপ্রিল ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ৭।

১৫. দৈনিক বাংলা, ১ জুলাই ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ৭।

১৬. দৈনিক সংবাদ, ২৯ মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ ১ ও ৮।

১৭. দৈনিক সংবাদ, ২৮ মার্চ ১৯৯৪, পৃঃ ১ ও ৮।

১৮. দৈনিক বাংলার বাণী, ৩ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ১।

১৯. দৈনিক বাংলার বাণী, ৫ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ১।

২০. সচিত্র সময়, ৬জুন ১৯৯২ পৃঃ ৬।

২১. দৈনিক বাংলার বাণী, ১২ ফেব্রয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ২।

২২. শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

২৩. দৈনিক বাংলা, ২ মার্চ ১৯৯২ পৃঃ ১ ও ৮।

২৪. শাহরিয়ার কবির প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

২৫. দৈনিক বাংলার বাণী, ১৩ এপ্রিল ১৯৯২, পৃঃ ১।

২৬. শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

২৭. দৈনিক সংবাদ, ১ জুলাই ১৯৯২, পৃঃ ১ ও ১২।

২৮. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৩০. শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৩১. দৈনিক সংবাদ, ২৭ জুন ১৯৯৪, পৃঃ ১।

৩২. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৩৩. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি* (ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ২০০৮) পৃ. ৬৯।

৩৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭০।

৩৫. তাহমিদা সাঈদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৩৬. লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৪০. জাহানারা ইমাম বেঁচে না থাকায় তাঁর দু'জন সহযোগী ও ছোট বোনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। জাহানারা ইমামের দু'জন সহযোগী হলেন শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ও সৈয়দা সালমা হক। শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ১৫-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। সৈয়দা সালমা হক ১৭-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন। জাহানারা ইমামের ছোট বোন তাহমিদা সাঈদা ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার দেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এটা সুস্পষ্ট যে ভাষা আন্দোলনে নারী অংশ গ্রহণ ছাড়া ভাষা আন্দোলন পূর্ণতা পেত না। যা এই গবেষণাকর্মের দু'জন নারী ভাষা সৈনিকের কেস-স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে। ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে নারীদের বিজয় এর কথা হালিমা খাতুনের বক্তব্য থেকে বের হয়ে এসেছে। ১৯৫৪ পরবর্তী ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলনেও নারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা ও গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে ১৯ জানুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরের দিন ২০ জানুয়ারি আসাদ শহীদ হয়। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৪ জানুয়ারি হরতাল পালনের সময় ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা হাতে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে যান। এর পর তার পিছনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ পল্টন ময়দানের দিকে এগিয়ে যান (কবি সুফিয়া কামালের ১৯৬৯ সালের ব্যক্তিগত দিন লিপি)। ফেব্রুয়ারিতে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ শোক মিছিল বের করে। ১৯৬৯ এ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পর আসে শেখ মুজিবের অসহযোগের ডাক। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দেশব্যাপী নারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপি নারী জাগরণের এই জোয়ার বইতে শুরু করে। এ সময় দেশব্যাপী নারী জাগরণের জোয়ার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নারীদের অসীম বীরত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বিপক্ষে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাওয়াতে কমবেশি আক্রান্ত হবার আশংকা নিহিত ছিল। নারীর ক্ষেত্রে এ আশংকা ছিল বেশি। এসব ঝুঁকিকে সঙ্গে নিয়েও ভাষা আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি অসংখ্য নারী অংশগ্রহণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে নারীদের একটা স্বতন্ত্র অর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল। দীর্ঘ কয়েক দশক পার হয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের অনেকের খবর আমাদের এখনো অজানা। এদের নিয়ে বিশেষ কোন গবেষণা বা লেখালেখি হয়নি। তাই তাদের সেই গৌরবময় ভূমিকা স্পষ্টভাবে আজও উঠে আসেনি। হয়তো আমরা কিছুদিন পর নারী ভাষা সৈনিকদের কাহিনী তাদের মুখ থেকে সরাসরি শোনার সুযোগ হারিয়ে ফেলবো। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানের ২৭ {(সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী) ও ২৮ [(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন]} ধারায় নারীর সমতা বিষয়ক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরকালে ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবী করেন মহিলা পরিষদ। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ধর্ম-নির্ভর রাজনীতি পুনরায় শুরু হয় কিন্তু এর বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিও ছিল তৎপর।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীরা যে ভূমিকা পালন করেছেন। তা দুটি কেস-স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'জন নারীর কেস-স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। দু'জন দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেছেন। দু'জনে শৈশব থেকে ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠার কারণ ছিল তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিবেশ। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান যুগের ক্রান্তিকালীন সময়ে তাদের বেড়ে ওঠা। দু'জনই অতি কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। এর পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু নারী শিক্ষার্থীর শূন্যতা। সবকিছু মিলেই তাদের মধ্যে একধরনের বিবেকের তাড়ণ ঘটে। এ থেকেই তাদের প্রগতিশীল রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া। বেগম রোকেয়ার ভাবনায় তাই বলতে হয় *"বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে----এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবেনা"-(রোকেয়া সাখাওয়াত হেসেন, স্ত্রী জাতির অবনতি: মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ: ২৭, ২৮।)* তারা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রগতিশীল রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রী সংগ্রহ করে রাজপথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বটতলায় সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা উভয়ই সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখিন হয়েছিলেন। আজও তাঁরা স্বপ্ন দেখেন একটা শোষণমুক্ত বাংলাদেশের। তাঁদের সেই বীরত্বময় কাহিনী গবেষণা কর্মে তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও প্রত্যক্ষ করি নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা। একদম সাধারণ নারী থেকে শুরু করে সমাজের উচু স্তর পর্যন্ত সব স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে আমরা নারীকে দেখি প্রনোদক, পরামর্শক, নিয়ন্ত্রক ও সংগঠকের ভূমিকায়। তাই বলা হয় যে মুক্তিযুদ্ধেও নারীর অবদান অনেক। দুটি কেসস্টাডির মাধ্যমে গবেষণা কর্মটিতে মুক্তিযুদ্ধে দু'জন নারীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ধর্ম-নির্ভর রাজনীতি পুনরায় শুরু হয়। প্রথম পর্বে সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরে নির্বাচিত শাসকদলের সহযোগিতায় মৌলবাদি ও সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পূর্নবাসিত হয়। এর বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিও ছিল তৎপর। পরবর্তিতে *একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটি*র নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল জাহানারা ইমাম। তিনি *একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি*র সভাপতি হিসেবে স্বাধীনতা উত্তরকালে

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল আন্দোলনে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একাত্তরে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু একজন মা, একজন আশ্রয়দাত্রী হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ষাটের দশক থেকে তিনি লেখা লেখিতে সম্পৃক্ত হন। জাহানারা ইমাম ছিলেন বিবেকবান, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তি যুদ্ধের একজন শহিদের জননী। তিনি বিশ্বাস করতেন, যুদ্ধাপরাধ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এর ক্ষমা নেই। যুদ্ধাপরাধী মৌলবাদীরা কখনো গণতন্ত্রের পক্ষে বা সহযোগী শক্তি হতে পারে না। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন তিনি। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন নব প্রজন্মের রয়েছে সম্ভাবনা। এই প্রজন্মকে দীক্ষিত করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ।

সার্বিক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর ইতিহাস উজ্জ্বল। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এই গবেষণায় কেস-স্টাডির মাধ্যমে নারীর সফলতা ও সীমাবদ্ধতার চিত্র অংকিত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বীর নারীদের অবদান জানতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে তাঁদের জীবন-দর্শন ও ভাবনা পরবর্তী প্রজন্মকে সত্য, ন্যায়, জ্ঞান ও আলোর পথের পথিক হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

নেলী সেনগুপ্তা

১৮৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর নেলী সেনগুপ্তা ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেণ। রাজনৈতিক নেত্রী। ১৯০৪ সালে তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেন। স্বামী ভারতবর্ষের খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা খতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ১৯৪০ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বিপুল ভোটে পুনঃ নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় আসেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী হওয়ার পর তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ হন। ১৯৭৩ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৩ সালের ২৩ অক্টোবর নেলী সেনগুপ্তা কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, ঢাকা, বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ১৯৯৮. পৃ.৯৬)।

শামসুন নাহার মাহমুদ

১৯০৮ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ নুরুল্লা, মা আসিয়া খাতুন। শামসুন নাহার এর প্রপিতামহ মুনশী তমিজুদ্দিন আহমেদ ছিলেন তখনকার একজন নামকরা সরকারি উকিল। তমিজুদ্দিন আহমেদ এর পরিবারে, ৫জন গ্রাজুয়েড ডিগ্রীধারী সন্তান ছিলেন, এজন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্ত্রীকে 'রত্নগর্ভা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শামসুন নাহার মাহমুদ একজন রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন। (মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃ. ১১৩)।

সুফিয়া কামাল

১৯১৯ সাল ২০ জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগনার রাহাত মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা জেলার শিলাউরে। বাবা- সৈয়দ আবদুল বারি ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং পেশায় আইনজীবী। মা- সৈয়দা সাবেরা খাতুন। সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তিনি ১৯৩১ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন। লেখালেখির পাশাপাশি রাজনীতিসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪০ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ বাংলাদেশের সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রদূত সুফিয়া কামাল। (মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃ. ৩৯)।

দৌলতুন্নেসা খাতুন

১৯২২ সালের ১৬ জুন (আনুমানিক) বগুড়া জেলার সোনাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবাা- মোহাম্মদ ইয়াছিন মা- নুরুন্নেসা খাতুন। স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমান। দৌলতুন্নেসা ১৪ বৎসর বয়সে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, তৎকালীন প্রাদেশিক

Dhaka University Institutional Repository
সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালে ৪ আগষ্ট দৌলতুন্নেসা মৃত্যু বরণ করেন। (শত বছরে বাংলাদেশের নারী, পৃ. ৬১-৬২)।

মেহেরুন্নেসা খাতুন

১৯২৪ সালে নোয়াখালীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ফেনী সদর উপজেলার শরিষাদী গ্রামে। বাবা-খান বাহাদুর আব্দুল গোফরান ছিলেন যুক্তবাংলার সাবেক মন্ত্রী। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৯৬১ সালে এল.এল.বি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। মেহেরুন্নেসা বাংলাদেশের একজন আইনজীবী ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, পৃ. ১৫৮)।

বদরুন্নেসা আহমদ

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ আব্দুল মুক্তাদির ও মা সৈয়দা মাহমুদা খাতুন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে কুষ্টিয়া আইন পরিষদ থেকে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সভানেত্রী এবং পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ মে আজীবন সংগ্রামী বদরুন্নেসা আহমদ মৃত্যু বরণ করেণ। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯-২২)।

নুরজাহান মুরশিদ

১৯২৫ সালের ২২ মে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার অন্তর্গত তারানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেণ। মা বেগম খতিমুন্নেসা ও বাবা মোঃ আইয়ুব হোসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন বিভিন্ন দেশ ঘুরে। বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ-এর সহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। নূরজাহান মুরশিদ ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৩ মৃত্যুবরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৩)।

সেলিনা বানু

১৯২৬ সাল ১৩ অক্টোবর পাবনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। মা- হাজেরা খাতুন। বাবা খান বাহাদুর ওয়াসীম উদ্দিন আহমেদ পাবনার প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ও দীর্ঘ দিন পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বি. এস. সি. এবং ১৯৬১ সালে বি. এড পাশ করেন। অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালীন তিনি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository
১৯৭০ সালের নির্বাচনে ও ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। মুক্তিযুদ্ধ সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ১৯৮৩ সালের ২৬ জানুয়ারী সেলিনা বানু মৃত্যু বরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৫-৬)।

নাদেরা বেগম

নাদেরা বেগম ১৯২৯ সালের ২ আগষ্ট বগুড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। মা আফিয়া বেগম। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ পাস করেন এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। কবীর চৌধুরী এবং মুনীর চৌধুরী তার বড় দুই ভাই। স্বামী গোলাম কিবরিয়া। বর্তমানে তিনি অবসর সময় কাটান বই পড়ে এবং বাগান করে। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, সেলিনা হোসন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ; ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫২-৫৪)।

ড. সুফিয়া খাতুন

১৯৩১ সালের ১৫ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার আফিতমারী উপজেলাধীন দক্ষিণ বত্রিশ হাজারী(বিন্নাগারী) গ্রামে, জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পড়ার সময় তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি এম.এড ডিগ্রী এবং ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিটে যোগদান করেছিলেন। (নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল, পৃ. ৭৬)

সুফিয়া আহমেদ

১৯৩২ সাল ২০ নভেম্বর ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা বিচারপতি মোঃ ইব্রাহীম। মা- বেগম লুৎফননেছা। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৫-৫৬)।

সারা তৈফুর

তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। কর্মী হিসেবে তিনি পোস্টার লেখা ও স্কুল কলেজের ছাত্রীদের আন্দোলনে নিয়ে আসা ইত্যাদি কাজ করতেন। (বাহান্নর ভাষা কন্যা, তুষার আব্দুল্লাহ সম্পাদিত)।

মতিয়া চৌধুরী

১৯৪২ সালের ৩০ জুন মাদারীপুর শহরে মতিয়া চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের মাহমুদকান্দা গ্রামে। মা- নুরজাহান বেগম, বাবা- মহিউদ্দিন

আহম্মদ চৌধুরী, পেশায় পুলিশ অফিসার। ইডেন কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করে ১৯৬৩ তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে এম.এস.সি. তে ভর্তি হন। ইডেন কলেজ অধ্যায়ন কালীন ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে রোকেয়া হলের ভিপি এবং ১৯৬৪ সালে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধা বিভক্ত হলে সোভিয়েত পন্থী প্যানেল হিসাবে পরিচিত অংশে ডাকসু জিএস মতিয়া চৌধুরী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেন। সপ্তম জাতীয় সংসদের মাননীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত আছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭৫-১৭৭)।

মালেকা বেগম

মালেকা বেগম ১৯৪৪ সালের ৩মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আব্দুল আজিজ এবং মা ফাহমিদা বেগম। তাঁর বাবা ইনকাম ট্যক্সের অফিসার ছিলেন। মেট্রিক পাশের পর ১৯৬০ সালে তিনি ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে, বাংলায় অনার্স এ ভর্তি হন। এরপর এম.এ ও পরে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনে মালেকা বেগম ১৯৬২ সাল থেকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮০)।

শামসুন নাহার ইকো

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান থানার আবীর পাড়া গ্রামে, নানার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন শামসুন নাহার ইকো। বাবা আব্দুল গফুর শিকদার এবং মা সাফিয়া খাতুন। ১৯৬৯ সালের, গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন এবং ছাত্রলীগ করতেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও মহিলা মুক্তিযুদ্ধা সংসদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৯)।

ফরিদা খানম সাকী

ফরিদা খানম সাকী ১৯৪৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বরগুনায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা আব্দুল আলিম, মা লুৎফুন নাহার বেগম। আব্দুল আলিম সরকারি চাকুরি করতেন। ফরিদা খানম সাকী ১৯৭১ সালে ভারতে যান এবং আগরতলায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেন। গেরিলা ট্রেইনিং এর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর স্বামী মাহমুদুর রহমান বেলায়েত মুক্তিযুদ্ধের সময় বি.এল.এফ এর নোয়াখালী জেলা কমান্ডার ছিলেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৭)।

শিরিন বানু মিতিল

শিরিন বানু মিতিল ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর পাবনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ শাহজাহান, মা রাজনীতিবিদ ও সাবেক সাংসদ সেলিনা বানু। শিরিন বানু পাবনা

Dhaka University Institutional Repository
এডওয়ার্ড কলেজে অনার্সে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় পাবনা জেলা শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭২ সালে, সাবসিডিয়ারি পাশ করে, স্কলারশীপ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। সেখান থেকে ইতিহাসে এম.এ ও এডভান্স কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৮০ সালে, দেশে ফিরে আসেন। তিনি এখনও নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ২৫৮)।

তারামন বিবি

১৯৫৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস কুড়িগ্রামে। তাঁর পিতা একজন কৃষক ছিলেন এবং মাতা কুলসুম ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করতেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ৪২৬ জন বীরপ্রতীকের একজন হিসেবে মনোনীত হন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, পৃ.৭৪)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মৌলিক উৎস

Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol.2, No.1, February, 24, 1948, p,7

Election Commission of Pakistan, Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly 1954, (May 1977), p.2.

National Education Commission Report (Government of Pakistan) 1959,p. 373

National Assembly of Pakistan Debates, Official Report, 4th July 1967, p. 2663.

পত্রিকা

১. আজাদ, ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৯।

২. দৈনিক সংবাদ, ২০ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৩. দৈনিক বাংলা, ২৭ মার্চ, ১৯৯৪।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ মার্চ, ১৯৯৩।

৫. দৈনিক বাংলা, ২৭ জুন, ১৯৯৪।

৬. আজাদ, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭।

৭. আজাদ, ৪ অক্টোবর, ১৯৫০।

৮. আজাদ, ৫ ফ্রেবয়ারি, ১৯৫২।

৯. আজাদ, ২১ ফেব্রয়ারি, ১৯৫২।

১০. আজাদ, ২২ ফেব্রয়ারি, ১৯৫২।

১১. আজাদ, ২৭ ফেব্রয়ারি, ১৯৯২।

১২. দৈনিক সংবাদ, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৮।

১৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯।

১৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

১৫. দৈনিক সংবাদ, ৩ মার্চ ১৯৭১।

১৬. দৈনিক সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১।

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মার্চ, ১৯৭১।

১৮. সপ্তাহিক নয়া পদধ্বনি, ৭ জুন, ১৯৮১'

১৯. দৈনিক সংবাদ, ২০ জানুয়ারি, ১৯৯২।

২০. দৈনিক বাংলা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১।

২২. দৈনিক বাংলা, ২৯ মার্চ ১৯৯২।

২৩. দৈনিক সংবাদ, ১৩ এপ্রিল ১৯৯২।

২৪. দৈনিক বাংলা, ১ জুলাই ১৯৯২।

২৫. দৈনিক সংবাদ, ২৯ মার্চ ১৯৯৩।

২৬. দৈনিক সংবাদ, ২৮ মার্চ, ১৯৯৪।

২৭. দৈনিক বাংলার বাণী, ৩ জানুয়ারি, ১৯৯২।

২৮. দৈনিক বাংলার বাণী, ৫ জানুয়ারি, ১৯৯২।

২৯. সচিত্র সময়, ৬ জুন ১৯৯২।

৩০. দৈনিক বাংলার বাণী, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৩১. দৈনিক বাংলা, ২ মার্চ, ১৯৯২।

৩২. দৈনিক বাংলার বাণী, ১ এপ্রিল, ১৯৯২।

৩৩. দৈনিক সংবাদ, ১ জুলাই, ১৯৯২।

৩৪. দৈনিক সংবাদ, ২৭ জুন, ১৯৯৪।

৩৫. *The Saturday Review*, USA, 22 May , 1971

দ্বৈতয়ীক উৎস : বাংলা গ্রন্থ

অমিতাভ গুপ্ত, *গুতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিবঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনালেখ্য*, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী; ১৯৯৭।

আতিউর রহমান সম্পাদিত ভাষা- *আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০।

সোনিয়া নিশাত আমিন, বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৮৬-১৯৩৯ (অনুবাদ পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমি, ঢাকা : ২০০২।

ড. মো মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১ ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

আলতাফুর রহমান, *শত্রুর মাটিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৯।

আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

আবুল কাসেম, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, ১৯৬৯।

আব্দুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, ঢাকা: মুকতধারা, ১৯৭৬।

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ বিতান, ১৯৬৮।

আব্দুল মতিন, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* ও বাংলাদেশ ১৯৭১, লন্ডন: র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা: ইউনিয়ন পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

আয়শা খানম, (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০১।

ইসমাইল হাসান বকুল, ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: রক্তঝরা একুশ, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০০।

এম আর আকতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯ ।

এম, আর, আখতার মকুল, *চরম পত্র*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ২০০০।

এম. এম. আকাশ, *ভাষা আন্দোলন: শ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রবনতা সমূহ*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

কনক মুখোপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ১৯৮৫।

কাজী জাকির হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো*, ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনা, ১৯৯০।

কবীর মুজিব মেহেদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা: ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভলপমেন্ট, ২০০৬।

কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা: স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬।

খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ঢাকা; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

গাজীউল হক, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

গাজিউল হক ও এম আর আকতার মুকুল, *বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৩৯১।

জাহানারা ইমাম, এ*কাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ২০০৮।

জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী*, ঢাকা: শব্দশৈলী প্রকাশনী, ২০০৭।

জ্ঞান চক্রবর্তী , *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টি ও অতীত যুগ*, ঢাকা : জনসাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৭২।

ড. এম,এ হাসান, *যুদ্ধ এবং নারী*, ঢাকা: জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউমেন স্টাডিস সেন্টার, ঢাকা: ২০০২।

ড. মাহফুজুর রহমান, *বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ*, চট্রগ্রাম: আরাকান হাউজিং সোসাইটি , ১৯৯৪।

ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* , ঢাকা: সময় প্রকাশনা, ১৯৯৯।

তপন কুমার দে, মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ, ঢাকা: নিউএজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭।

নিবেদিতা দাশ পুরাকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী, ঢাকা: প্যাপিরাস, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা (সম্পাদিত), *একাত্তরে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৭।

পান্না কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯।

বদরুদ্দিন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।

বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯০।

বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮০।

বদরুদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

বদরুদ্দিন উমর, *যুদ্ধ পূর্ব বাংলাদেশ*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৭৬।

বদরুদ্দিন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

বদরুদ্দিন উমর, *আমাদের ভাষার লড়াই*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯।

বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৯।

বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

মফিদুল হক , *নারীমুক্তির পথিকৃৎ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭।

মনসুর আহমদ খান (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

মতিয়া চৌধুরী, *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা এাকডেমী, ১৯৮৫।

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনষ্টিটিউট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ঢাকা :দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪।

মালেকা বেগম, *নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

মোহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *একাত্তরের বিজয় গাঁথা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

মুনতাসির মামুন ও হাসিনা আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধের পঞ্জি-৩ রেহানা হক, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ২০০৭।

মুসা সাদিক, *মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম*, ঢাকা: গুলশান এভিনিউ, ১৯৯৫।

মুস্তফা নুরুল ইসলাম, *আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৮৪।

মোস্তফা কামাল, ভাষা আন্দোলন, *সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুকসোসাইটি, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।

মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলামিত্র*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনষ্টিটিউট , ২০০১।

মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ২০০০।

মোঃ আবদুল্ আউয়াল, *বাংলাভাষার ইতিহাস*, ঢাকা: আহম্মেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৩।

মোহাম্মদ সাদাত আলী, *রনাঙ্গন' ৭১ সাতাশটি* বৃহৎ যুদ্ধ, ঢাকা: বাংলা বাজার, ২০০৫।

মেসবাহ কামাল, *আসাদ ও ঊনসত্তরের গন অভ্যুত্থান*, ঢাকা: বিবর্তণ, ১৯৮৬।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতির পুনরুদ্ধার*, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বুলেটিন ১৯৯৬।

মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গনঅভ্যুত্থান*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

মোস্তফা কামাল, *সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৮৭।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০।

রফিকুল ইসলাম, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩।

রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), সম্মুখ সমরে বাঙ্গালি, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ*: প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

রেণু চক্রবর্তী, *ভারতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)*, কলিকাতা : মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৮০।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *স্ত্রী জাতির অবনতি : মতিচুর*, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

লুৎফর রহমান (সম্পাদিত), *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ* , ঢাকা: অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৫।

লুৎফর রহমান রিটন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যূত্থান: রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭।

শওকত আরা হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা: ওসমান গণি প্রকাশনী, ১৯৯৯।

শামসুল আলম সাইদ, *বাঙ্গালী জীবনে একুশ*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

শামসুজ্জামান খান এবং কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ* স্মৃতি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

শাহীন আক্তার (সম্পাদিত), *নারীর একাত্তরের ও যুদ্ধ পরবর্তী কথ্য কাহিনী*, ঢাকাঃ আইন, শালিস কেন্দ্র,

Dhaka University Institutional Repository

২০০১।

শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙ্গালীর অবদান*, ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

সাইদা জামান, *বাংলাদশের নারী চরিতাবিধান*, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক সংসদ, ১৯৯৮।

সাহিদা বেগম, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

সুকুমার বিশ্বাস, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও কলকাতার সংবাদ পত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯১।

সেলিনা হোসেন, *ঊনসত্তরের গণআন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডমী, ১৯৮৫।

সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯।

হাসান আনোয়ার, ভাষা থেকে মুক্তিযুদ্ধ, আতাউর রহমানের ৭টি গ্রন্থ : পাঠকের সমিকরণ, ঢাকা: ঋদ্ধি প্রকাশ, ১৯৯৮।

498087

হাসান হাফিজুর রহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন*, ঢাকা: পুঁথিপত্র, ১৯৫৩।

হাসান হাফিজুর রহামন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ:* দলিলপত্র, ঢাকা: গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার , তথ্য মন্ত্রনালয়, ১৯৮২।

হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

হেনা দাশ, *স্মৃতিময় একাত্তর*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

লুৎফর রহমান (সম্পাদিত) *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা ১৯৯৫।

শাহরিয়ার কবির, *গণআদালত ও জাহানারা ইমাম*, ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশ ২০১২।

তাহমিদা সাঈদা, *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম*, ঢাকা: বাঙ্গালী সমগ্র জাদুঘর ২০০৪।

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, *নারীর ক্ষামতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, ঢাকা মাওলা ব্রাদাস ২০০৩।

মোতাহার হোসেন মাহবুব, *যুদ্ধাদিনের কথা*, কুমিল্লা বিনয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৭

বাংলা প্রবন্ধ

আলম তাজ বেগম ছবি, '*মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ*', মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর স্মরনিকা, মুক্তিযোদ্ধা বিজয় মিলন ২০০০, ঢাকা: পৃ. ২৩-২৪।

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, '*মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস বিভাগ*', স্মরনীকা, ১৯৯২, বিজয় দিবস সংখ্যা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯-১১।

গাজীউল হক, *একুশের সংকলন ১৯৮০:* স্মৃতিচারণ, ঢাকা: বাংলা একাডমী, ১৯৮০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ডি. এ. রশীদ ও মহিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *একুশের সংকলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৫৬।

ফজিলা আক্তার জোছনা, *'স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা'*, বাংলাদেশে ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ছাত্রী টিম, ১৯৯৩।

রফিকুল ইসলাম, *'স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা'*, রোববার, ১৪ মার্চ ২৭ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪-১৩।

ইংরেজি গ্রন্থ

Choudhury, A. K, *Independence of East Bangal (Bangladesh*: Jatiya Grantha Kendra, 1984).

Hannan, Mohammed, *The Liberation Struggle of Bangladesh: A Brief Juvenile History of the Bangali Nation* (Dhaka: Hakkani Publishers,1999).

Haq, Obaidul, *Bangabandhu Sheikh Mujib a Leader with a Difference* (London: Radical Asia publications, 1973)

Jaleel, M.A *Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A Historical Necessity* Dhaka: M.A. Jaleel, 1983).

Khan, Ataur R, *India, Pakistan and Bangladesh: Conflict or Co-operation*? (Dhaka: Sindabad, 1976).

Khan, Mohammad Ayub, *Friends Not Masters*: *A Political Autobiograph*, (Karachi: Oxford University press, 1967).

Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (eds), *Women of Pakistan*, Zed Books Ltd. London & New Jersey, U.S.A. 1987.

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ঃ

বাংলার সমাজ ও নারী ঃ ১৯০৫-১৯৪৭, পি. এইচ. ডি ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভ গবেষক আরেফিন সুলতানা, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৯।

বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ধারা ঃ ১৯৪৭-১৯৯৫, পি. এইচ. ডি ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভ গবেষক মীর জাহীদা নাজনীন, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, জুন ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ ঃ পাঁচটি কেস-স্টাডি (১৯৫২-১৯৯৪)

সাধারণ তথ্যঃ

১. আপনার নাম কি?

২. ডাক নাম কি?

৩. আপনার বৈবাহিক অবস্থা? বিবাহিত/অবিবাহিত/অন্যান্য ....

বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. বর্তমান ঠিকানা কি?

২. পারিবারিক তথ্য- (যার সঙ্গে আছেন তার তথ্য)

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষা	পেশা

৩. নতুন ঠিকানায় কত দিন আছেন?............... এবং কিভাবে সময় অতিবাহিত করেন?

৪. পূর্বে কোথায় কোথায় ছিলেন?

৫. ভাষা আন্দোলনের পূর্বে কোথায় কোথায় ছিলেন?

৬. ভাষা আন্দোলনের পর কোথায় কোথায় ছিলেন?

৭. ভাষা আন্দোলনের সময় কোথায় কোথায় ছিলেন?

৮. ভাষা আন্দোলনের সময় কে কে আপনার সঙ্গে থাকতেন?

৯. উক্ত সময়ে আপনি কোন বাম রাজনৈতিক সংগঠন/ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না? বিস্তারিত বলুন?

১০. ৬৯ এর আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলেন?

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃকুল সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (বাবার বাড়ি/নানার বাড়ি)

২. নানার বাড়ি জন্মগ্রহণ করলে তার ঠিকানা বলুন?

৩. ঐ সময়ে নানার বাড়ির পারিবারিক তথ্য

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষা	পেশা

৪. আপনার নানার পরিবারের কেউ (নানা, মামা, খালা, বা অন্য কেউ) রাজনৈতিক সংগঠন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কি না? জড়িত থাকলে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা বলুন। ঐ সময়ে আপনার নানার পরিবারের কেউ ঢাকায় চাকুরি করতেন কিনা? করলে তার সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এবং তার কাছ থেকে কি ধরনের খবরাখবর পেতেন।

পিতৃকুল সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. আপনার পৈতৃক বাড়ি কোথায়? (গ্রাম/শহর)

২. ঐ সময়ে আপনার বাবার বাড়ীর পারিবারিক তথ্য।

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষা	পেশা

৩. আপনার বাবার পেশা কি ছিল? চাকুরিজীবী হলে কত টাকা বেতন পেতেন।

৪. তিনি কখনো চাকুরিচ্যুত হয়েছেন কি না? হলে তার কারণ কি?

৫. বাবার পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস কি ছিল?

৬. আপনার বাবার কত বিঘা জমি ছিল?

Dhaka University Institutional Repository

৭. আপনার বাবার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল?

৮. বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামে (৫২, ৫৪,৬৬ বা ৬৯) আপনার বাবা বা আপনার পরিবারের কেউ (দাদা, চাচা, ফুপা, ফুপু বা অন্য কেউ) রাজনৈতিক সংগঠন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কি না? জড়িত থাকলে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন এবং এ ব্যাপরে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা বলুন। ঐ সময়ের আপনার বাবার পরিবারের কেউ ঢাকায় চাকুরি করতেন কিনা? করলে তার সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এবং তার কাছ থেকে কি ধরনের খবরাখবর পেতেন।

শ্বশুরকুল সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. আপনার স্বামীর নাম কি? কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল? আপনার স্বামীর গ্রামের বাড়ি কোথায়?

২. আপনি শ্বশুর বাড়িতে/স্বামীর কর্মস্থলে থাকতেন? বিস্তারিত বলুন।

৩. ঐ সময়ে আপনার স্বামীর পারিবারিক তথ্য।

ক্র. ইং	নাম	বয়স	সম্পর্ক	লিঙ্গ	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষা	পেশা

৪. স্বামী জীবিত আছেন কিনা?

৫. জীবিত থাকলে তার শারিরীক অবস্থা কেমন?

৬. বর্তমানে তিনি কিছু করেন কিনা?

৭. পূর্বে তিনি কোন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন কিনা থাকলে বিস্তারিত বলুন

৮. বিয়ের পূর্বে তার সাথে আপনার পরিচিত ছিল কিনা?

৯. যদি পরিচয় থাকে তবে কত দিনের?

১০. কতদিন পরে আপনাদের বিয়ে হয়?

১১. বিয়ের সময় আপনি কোন শ্রেনীতে পড়াশুনা করতেন?

১২. আপনার স্বামী বা তার পরিবারের কেউ বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামে (৫২, ৫৪,৬৬ বা ৬৯) জড়িত ছিলেন কি না? জড়িত থাকলে তাদের সম্পর্কে বিস্ড্ররিত বলুন এবং এ ব্যাপরে তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা বলুন। ঐ সময়ের আপনার বাবার পরিবারের কেউ ঢাকায় চাকুরি করতেন কিনা? করলে তার সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এবং তার কাছ থেকে কি ধরনের খবরাখবর পেতেন।

১৩. আপনার শ্বশুরের পেশা কি ছিল? চাকুরীজীবি হলে কত টাকা বেতন পেতেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. তিনি কখনো চাকরিচ্যুত হয়েছেন কিনা হলে কেন?

১৫. পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস কি ছিল?

১৬. আপনার শ্বশুর কি করতেন?

১৭. আপনার শ্বশুরের বা স্বামীর মাসিক আয় কত ছিল?

১৮. রাজনৈতিক কারনে আপনার শ্বশুরের বা স্বামীর পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন কিনা?

প্রাক ও প্রাইমারী স্কুল জীবন

১. স্কুল জীবন শুরুর পূর্বে আপনি কোথায় কোথায় অতিবাহিত করেছেন বিস্তাারিত বলুন?

২. সেই সময়ের কোন উলেল্লখ যোগ্য স্মৃতির কথা বর্ণনা করুন?

৩. আপনি কোন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন?

৪. প্রাইমারি শিক্ষাটা কোথায় কোথায় নিয়েছেন? (মামার বাড়ি/বাবার বাড়ি/বাবার কর্মস্থান) বিস্তারিত ।

৫. সেখানকার কোন শিক্ষক বা কেউ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক চর্চা করাতেন কিনা? করলে বিস্তারিত বলুন।

৬. তখনকার দিনে কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন কিনা, থাকলে তারা কি কি পড়াতেন?

৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আপানাদের কি ধরনের পাঠ্য বিষয় ছিল?

৮. প্রাইমারী স্কুলে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করতো কিনা?

৯. করলে তাদের অনুপাত আনুমানিক কেমন ছিল?

১০. সহপাঠিদের মধ্যে কতজন মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রী ছিল?

১১. তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল? বিস্তাারিত বলুন।

১২. ক্লাসে পড়াশুনায় আপনি কেমন ছিলেন?

১৩. একজন লোক একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখা পড়া করতে পারে, আপনি এরকম করেছেন কিনা বিস্তারিত বলুন?

মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন

১. কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি জুনিয়ার বা মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করেছেন?

২. সেখানে কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক চর্চা হত কিনা বিস্তারিত বলুন?

৩. সেই সময় আপনার মানষিক অবস্থা কেমন ছিল? এবং শিক্ষকদের আচার আচরণ কেমন ছিল?

৪. কোন শিক্ষক দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেল কিনা বিস্তারিত বলুন?

৫. তখনকার দিনে কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন কিনা? থাকলে তারা কি কি পড়াতেন?

৬. মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য বিষয় কি কি ছিল বিস্তারিত বলুন?

৭. ক্লাসে পড়াশুনায় আপনি কেমন ছিলেন ?

৮. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করতো কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

৯. হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রী কতজন ছিল তাদের আনুপাতিক হার কত?

১০. তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন ছিল বিস্তাারিত বলুন?

১১. মাধ্যমিক পর্যায়ে আপনার লেখাপড়া কোন কারণে বন্ধছিল কিনা? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন।

১২. ঐ সময় পর্দা প্রথা কেমন ছিল এবং আপনি পর্দা করতেন কিনা? করলে বিস্তারিত বলুন। না করলে আপনার প্রতি সমাজের মনভাব কেমন ছিল বিস্তাারিত বলুন।

১৩. ম্যাট্রিকুলেশন দিয়েছিলেন কিনা?

কলেজ জীবন

১. ইন্টারমিডিয়েট কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

২. শহরে হলে কোথায় থাকতেন? পড়াশুনার খরচ কে নির্বাহ করত? যেখানে থাকতেন সেখানে কেউ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের **সঙ্গে** জড়িত ছিল কিনা? বা ছাত্রবাস হলে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তাারিত **বলুন**।

৩. পাঠ্য বিষয় কি কি ছিল?

৪. সেই সময় আপনার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? শিক্ষকদের আচার আচরণ কেমন ছিল?

৫. কোন শিক্ষক দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন কিনা?

৬. কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন কিনা? তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

৭. কতজন ছাত্রী ছিল? তাদের অনুপাত কত?

৮. হিন্দু মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা কত? তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

৯. আপনি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা থাকলে বিস্তারিত বলুন?

কলেজ পরবর্তী জীবন

১. ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আপনি কোথায় লেখা পড়া করেছেন? শহরে হলে কোথায় থাকতেন? পাড়শুনার খরচ কে নির্বাহ করত? যেখানে থাকতেন সেখানে কেউ রাজনৈতিক **বা** সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের **সঙ্গে** জড়িত ছিল কিনা? বা ছাত্রবাস হলে সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তাারিত **বলুন**।

২. এ পর্যায়ে এসে টিউশনি করতেন কিনা?

৩. পাঠ্য বিষয় কি কি ছিল?

৪. সেই সময় আপনার মানষিক অবস্থা কেমন ছিল? শিক্ষকদের আচার আচরণ কেমন ছিল?

৫. কোন শিক্ষক দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন কিনা?

৬. কোন মহিলা শিক্ষক ছিলেন কিনা? তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

৭. কতজন ছাত্রী ছিল? তাদের অনুপাত কত?

৮. হিন্দু মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা কত? তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

৯. আপনি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা থাকলে বিস্তারিত বলুন?

১০. আপনি কোন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা? থাকলে আপনার পেশা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১৯৫৪ সাল

১. ১৯৫৪ সালে আপনার বয়স কত?

৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন কে আপনি কিভাবে দেখতেন? বর্ণনা করুন।

৫. ১৯৫৪ এর পর অভিগমন একটি বড় সমস্যা, দাঙ্গা ছিল একটি নিত্য ঘটনা- সেটা নিরসনে অনেক দাঙ্গা বিরোধী মিছিল হয়- আপনি কি কোন দাঙ্গা বিরোধী মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন? যোগ দিলে বিস্তাারিত বলুন।

৬. দেশত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তি আপনার পরিবার ক্রয় করেছিল কিনা?

৭. ৫৪ বা ৫৪ পরবর্তি সময়ে উলে- খযোগ্য নেতাদের সাথে সম্পৃক্ত বা যোগাযোগ থাকলে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলুন।

৮. পাকিস্থানী শাসকদের কোন কোন আচরণ আপনার কাছে খারাপ লাগত?

৯. আপনি কখনও কারাববণ করেছেন কিনা করলে কেন?

১০. আপনি রাজপথে কোন রাজনৈতিক মিছিল মিটিং করেছেন কিনা করলে কেন?

১১. ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন সর্ম্পকে জানেন কি ?

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্ব

১. ১৯৫৮ মালে সামরিক শাসন এর বির"দ্ধে যে আন্দোলন হয় সেখানে আপনার / অন্যনারীদের কোন ভুমিকা আছে কি ?

২. ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে সোহওয়ার্দির নেতৃত্বে গনতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন হয় সেখানে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভুমিকা আছে কিকোন ভুমিকা আছে কি ?

৩. ১৯৬২ এর ছাএ আন্দোলনে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভুমিকা আছে কি ?

৪. ১৯৬৪ এর ছাএ আন্দোলনে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভুমিকা আছে কি ?

৫. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন থেকে ৬৮ এবং ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থানে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভুমিকা আছে কি ?

১৯৭০ ও ১৯৭১ পর্বঃ

৬. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভুমিকা আছে কি ?

৭. মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ভূমিকা ছিল কিনা? হ্যা বা না হলে বিস্তারিত বলুন?

Dhaka University Institutional Repository

৮. মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন সব খ্যাতিনামা বা আলোচিত ব্যক্তিবর্গের সাথে আপনার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল কিনা? থাকলে বিস্তারিত বলুন।

৯. কি কারণে পূর্ব বাংলা জনসাধারণ ৭১ এর মুক্তি আন্দোলনে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১০. মুক্তিআন্দোলনে সাংবাদিকরা বা সংবাদপত্র কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল? বিস্তারিত বলুন।

১১. মুক্তি আন্দোলনের সময় অন্যান্য মাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন) কি ধরনের ভূমিকা পালন করত বিস্তারিত বলুন ?

১২. ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভূমিকা আছে কি ?

১৩. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভূমিকা আছে কি ?

১৪. মাস ভিত্তিক/ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে আপনার ভূমিকা ?

১৫. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তিকালে আপনার/ নারী সমাজের কোন ভূমিকা আছে কি ?

১৬. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তিকালে আপনি কোন কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন, কি দায়িত্বে ছিলেন এবং এক্ষেত্রে আপনার কর্মকান্ড এবং ভূমিকা কি ছিল ?

- রাজনৈতিক
- সামাজিক
- সাংস্কৃতিক
- পেশাগত
- নারী সংগঠন এবং
- অন্যান্য

অন্যান্যঃ

১. বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামের ফলে যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় সেই সপ্নগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা? হ্যাঁ বা না হলে বিস্তারিত বলুন।

২. কেমন দেশ প্রত্যাশা করেন বিস্তারিত বলুন? ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আপনার কিছু বলার থাকলে অনুগ্রহপূর্বক বলুন?

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরেরর ঘাতক দালল নির্মূল কমিটির

আহ্বায়ক এর সহযোগীদের উপর

প্রশ্নমালা

প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত)

১। আপনার নাম কি?

২।আপনার ডাক নাম আছে কি না? থাকলে কি।

৩। বর্তমান ঠিকানা।

৪। স্থায়ী ঠিকানা।

৫। অপনার বর্তমান বয়স কত?

৬। স্বাধীনতার পূর্বে কি করতেন?

৭। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৮। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?

৯। বর্তমান কিছু করেন কিনা করলে বিস্তারিত বলুন।

২য় অংশ

১। গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী দলের আমীর ঘোষনা করায় কেন বাংলাদেশে জন বিক্ষোবের সুত্রপাত হয়?

২। ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি কেন জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয়?

৩। সর্বসম্মতিক্রমে ঘাতক দালাল নিমূল কমিটির আহবায়ক কেন জাহানারা ইমামকে করা হয়?

৪। ১৯৯২ সালে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নিমূল জাতীয় সমম্বয় কমিটি গঠনে জাহানারা ইমাম এর কি ধরনের ভূমিকা রাখেন এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি কি করেছিলেন?

৫। গণআদালতের বিচারের দিন সকল বিচারকের উপস্থিতিতে বিচার কার্য হয়েছিল কিনা ? বিস্তারিত বলুন।

৬। গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট কি কি অভিযোগ আনা হয়।

৭। গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয়েছিল কি?

৮। গণআদালতে বিচারের রায় কি হয়? এই রায় কার্যকর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয় ?

৯। জাহানারা ইমাম একাত্তরের ঘাতক দালাল কমিটির আহবায়ক হওয়াতে তৎকালিন সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল কিনা? বিস্তারিত বলুন।

১০। গণআদালতের রায়ে যে গণআন্দোলন সংগঠিত হয় তার প্রেক্ষিতে সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের কোন চুক্তি হয়েছিল কিনা? হলে কি তা বিস্তারিত বলুন।

Dhaka University Institutional Repository

১১। একাত্তরের ঘাতক দালাল কমিটির সমাবেশে তৎকালিন সরকার কর্তৃক কোন নির্যাতন করা হয়েছিল কিনা, হলে কি ধরনের? তাতে জাহানারা ইমামের উপর কোন নির্যাতন হয়েছিল কিনা?

১২। গণ আদালত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত করেছিল কি না? করলে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দিয়েছিল কি না? উক্ত রির্পোটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

১৩। তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন কে?

১৪। জাহানারা ইমাম এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয় কোন সালে এবং প্রত্যাহার কর হয় কোন সালে।

১৫। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমান সংগ্রহ করার জন্য কেউ কি ভিন্ন মত পোষন করেছিলেন? ভিন্ন মত পোষন করলে কারা এবং কেন করেছিলেন।

১৬। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং গণআদালত তথা এই আন্দোলন সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কি?